সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

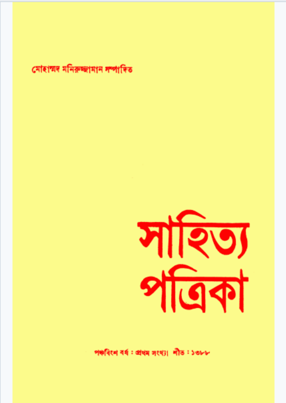

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

রোহিণী, বিনোদিনী ও কিরণময়ী

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Nilima Ibrahim
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.2
Pages	27-49
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রোহিণী, বিনোদিনী ও কিরণময়ী

নীলিমা ইব্রাহিম

কালের বিবর্তনে প্রাত্যহিক প্রথাগত জীবনে ধর্ম ও সংস্কৃতিবোধে ও ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ডে, মানবিক মূল্যবোধের প্রতিনিয়ত কতোইনা পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আমার কৈশোর ও তারুণ্যের কথা যখন ভাবি তখনকার গৃহজীবন ও সামাজিক জীবনধারা আজ প্রায় অবলুপ্ত, সেদিন ভাল ছিল, আজকের দিন মন্দ, একতরফা এমন কথা হলফ্ করে বলতে পারিনা। তবে আমাদের জীবনে দুটি শব্দ ও তার প্রভাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—শব্দ দুটি 'গুরুজন' ও 'মুরুব্বি'। পিতামাতা থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রতিবেশী একই স্কুলে অধ্যয়নরত উচ্চশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী সবাই ছিলেন এই শিরোনামাভুক্তির দলে। লর্ড টেনিসনের মতে আমার কালেও 'father's word was law.' দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে ব্রজেশ্বর পিতৃ-আজ্ঞায় সাহেবের কাছে যুক্ত করে ক্ষমা চেয়েছেন, 'সাহেব, আমরা হিন্দু, পিতার আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করিনা, আমি আপনার কাছে করজোড় করিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে মাফ্ করুন (দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিম-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬১)।

এ ভূমিকার কারণ আমার কৈশোর ও তারুণ্যে পাঠ্যপুস্তক ব্যতিরেকে যে কোন গ্রন্থ পাঠ ছিল নিষিদ্ধ। তবে ইংরেজি পুস্তক সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। সেকালে গোপনে ডিটেকটিভ্ বই পড়তে হতোনা। ইংরেজি বই হলেই মুরুব্বিরা ভাবতেন, যাক্, রাজভাষা শেখার চেষ্টা করছে, আখেরে কষ্ট হবেনা। স্কুলের নির্দিষ্ট প্রবন্ধ ছাড়া কালি-কলম এক হবার সম্ভাবনা ছিল না। এমনই সতর্ক শাসন আধুনিক তরুণের ভাষায় 'শোষণ ও নিষ্পেষণে'র ভেতর দিয়ে বড় হয়েছি, কিন্তু কি আশ্চর্য! তের বছর পার হবার আগেই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের তৎকালীন নিষিদ্ধ উপন্যাস পাঠ সমাপ্ত করেছি। আজকের দিনের মত ফ্লাটের বাসিন্দা আমরা ছিলাম না। বাড়িতে বাগান, পুকুর ঘাট, ছোটবড় অনেক কামরা ছিল। কিন্তু সবকিছুই খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে পারিনি। মেঘদূতের যক্ষপ্রেরিত মেঘের মত তার প্রাসাদে দ্রুত প্রবেশ করে সজল কণিকা নিক্ষেপের পর কপট প্রণয়ীর মত দ্রুত বাতায়ন পথে ধাবিত হতে হয়েছে। তাই উপন্যাস পড়েছি অর্থাৎ কাহিনী গলাধঃকরণ করেছি। সঙ্গে আবার প্রভাতকুমার, রমেশচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী ইত্যাদিও কম উৎপাত করেননি। এভাবে পড়বার ফলে কতগুলো উপন্যাসের কিছু চরিত্র অন্তরে এক একটি অদ্ভুত রেখাপাত করে গেছে। অদ্ভুত এই অর্থে বলছি যে আজ বুঝতে পারছি সে ধারণা কতো রোমাণ্টিক আবেগ সজল মনের ভ্রম ছিল মাত্র। যেমন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র দুশ্চরিত্রা, ভ্রষ্টা রোহিণীর আর্ত কণ্ঠ, 'মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিবনা, আর তোমার পথে আসিবনা, এখনই যাইতেছি, আমায় মারিওনা।' (ব-র ১, পৃ. ৫৯৫)। বিনোদিনীকে সরীসৃপ বিশেষ বলে মনে হতো। আর কিরণময়ী সেতো বহু ভোগ্যা বসুন্ধরা। শরৎচন্দ্র জীবনে যতো অপরাধ আমার কাছে করুন না কেন ওকে পাগল করে সেদিন আমার অসীম কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন।

কিন্তু সবশেষ তো শেষ নয়। তারপরও কিছু থাকে, অর্থনীতি চর্চার ফাঁকে ফাঁকে এই ছিল আমার উপন্যাসের ধারণা। তারপর গৃহের শাসনের নাগপাশ মুক্ত হয়ে কলকাতায় পড়তে এলাম। পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে স্থান পেলাম লেডী জেন্ ডাণ্ডাস হোস্টেলে। খাঁচার পাখি একেবারে বনপ্রান্তের নীল আকাশে। এখানে লাস্কির মলাটের ভেতর দীনেন রায়কে ভরতে হয়না। সোজা পুরানো বইয়ের দোকান থেকে কয়েক আনায় কিনে সারা রাত ধরে পড়া যায়। আস্তে আস্তে নতুন করে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ জাগলো। পিতা ছিলেন অন্ধ রবীন্দ্রভক্ত, মাইকেল শিষ্য, শরৎচন্দ্রের উদারতায় মুগ্ধ। এবারে আমি সাবালিকা সুতরাং তাঁর সঙ্গে সাহিত্যচর্চার সুযোগ পেলাম। হোস্টেলে কয়েকটি মেয়ে বাংলায় এম. এ. পড়তো। আমাদের কালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্স চালু হয়নি। সম্ভবত আমি যে বছর এম. এ. পাশ করেছি অর্থাৎ ১৯৪৩ সালেই প্রথম বাংলায় অনার্স চালু হয়। ওদের কাছ থেকে বই নিয়ে পড়তাম। ওরা অবজ্ঞার হাসি হাসত। চর্যাপদ পড়ে অবাক হলাম, কারণ আমি সংস্কৃত সাহিত্যের একজন দুর্বল ছাত্রী। আমার কাছে কিছুই সঙ্কট রইলোনা। তারপর একদিন পিতৃ বিষয় অর্থাৎ অর্থনীতির আকাশ থেকে ছিটকে এসে পড়লাম বাংলা সাহিত্যের অমৃত ভাণ্ডারে। গোপনে পাঠ্যউপন্যাস এখন আমার পাঠ্যবিষয়। সরল পিতৃদেব আমার এই অপকর্মের কথা জানতেন না। তিনি এম. এ. পরীক্ষার পর আর টাকা পাঠাবেন না এমন একটি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি কিছু দিন সময় চাইলাম। প্রথমা কন্যা যা প্রার্থনা করি তাই মঞ্জুর। প্রাণপণে খেটে বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দিলাম। ফলাফল এতই অবিশ্বাস্য হলো যে পিতৃদেব বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুপাত করলেন। বাংলা পড়ে মেয়ে যে সমাজে ব্রাত্য হয়ে গেল এ কথা কিছুক্ষণের জন্য তিনি বিস্মৃত হলেন।

শুরু হল গবেষণা কর্ম। বৃত্তি পেলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপরের ছাত্রী-জীবনের কাহিনী দীর্ঘ।

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে পড়াশুনার প্রচুর অবকাশ পেলাম। তারপর সবচেয়ে বড় শিক্ষক মহাবলে ধীরে ধীরে আমাকে প্রভাবিত করতে শুরু করলেন। আজ বাহ্য ইন্দ্রিয় যতো দুর্বল হচ্ছে, অন্তর-আকাশ মনে হয় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। সেই আলোকেই আজ তিন জন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের তিনটি চরিত্র মূল্যায়নে আমি প্রয়াসী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র বিনোদিনী আর শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ী। রূপদক্ষ এই তিন শিল্পীকে দেখবার জন্য যে-দৃষ্টির প্রয়োজন তা অর্জন না করেই এদের সম্পর্কে মন্তব্য করবার যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলাম আমার এই প্রবন্ধ অনেকটা তার প্রায়শ্চিত্ত। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য আমরা বঙ্কিমকে বলি, 'রক্ষণশীল', রবীন্দ্রনাথ 'প্রগতিশীল' আর শরৎচন্দ্র একেবারে 'বিপ্লবী'। তাঁদের সমকালে ব্যবহৃত এই বিশেষণগুলো সম্পর্কেও আমার প্রচুর পরিমাণে সঙ্কোচ, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব আছে। অবশ্য অনেকের বিরূপতা আমার প্রাপ্য পুরস্কার হবে আমি জানি, কিন্তু আমি সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমতে বিশ্বাসী 'যতো মত ততো পথ।' তাই আমার পথ ধরেই আমি বৈকুণ্ঠের যাত্রী আজ।

রক্ষণশীল বঙ্কিম-রচিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে বঙ্কিমকে তাঁর কালের পরিধিতে অতিমাত্রায় প্রগতিশীল বলে আমার ধারণা জন্মেছে। ভ্রমর সম্পর্কে অনেকেই তাঁর সমালোচনা করেছেন। তিনি হিন্দুরমণীকে গাউন পরিয়েছেন। অর্থাৎ হিন্দুধর্মীয় আচার অনুযায়ী যেখানে কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত স্বামীকে গনিকালয়ে পেঁৗছে দেবার শাস্ত্রীয় বিধা-নের কাহিনী আছে, সেখানে পাপিষ্ঠা ভ্রমর স্বামীকে পরিত্যাগ করে অতি আধুনিক ইয়াংকি কন্যার মত পিত্রালয়ে চলে গেল। সেদিনের সমাজপতিরা এটা পছন্দ করেননি।

কালের বিবর্তনে আজ ভ্রমরের জন্য আমাদের মানবধর্মে দ্বিতীয় কোনও বিধান নেই। সম্ভবতঃ ভ্রমর-চরিত্র চিত্রণে কোঁৎ প্রবর্তিত পজিটিভিজম্ বা হিতবাদ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। তা ছাড়া বালিকাবধূর অভিজ্ঞতা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই ছিল। ১৮৪৯ সালে অর্থাৎ মাত্র ১১ বছর বয়সে এক পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সুতরাং শুধু মাত্র পুতুল খেলার ঘরের অনেক চিত্রই তিনি ভ্রমর-গোবিন্দলালে নিজের চিত্তাকাশে প্রতিফলিত চিত্র থেকে নিয়েছেন। ১০ বছর পর তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়। অর্থাৎ প্রায় ভ্রমরের সমবয়সেই তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। পরবর্তীকালে ১৮৬০ সালে রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বঙ্কিমজীবনে রাজলক্ষ্মীর প্রভাব ছিল অপরিমেয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন : "আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারিনা।" (বঙ্কিমপ্রণাম : পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১৯৪)।

১৮৭২ সালের দিকে পিতা যাদবচন্দ্রের উইল নিয়ে আত্মীয়দের ভেতর বিরোধ বাধে এবং বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটাল পাড়ার পাট তুলে চুঁচুড়ায় আসেন। পরবর্তীকালে ১৮৭৫ সালে পুনরায় কাঁটাল পাড়ায় আসেন। এই সময়ে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচিত হয়। "কৃষ্ণকান্তের উইল' ১৮৭৮ সনে (ভাদ্র ১২৮৫) প্রথমে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের জীবিতকালে ইহার চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয় ১৮৯২ সনে। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসখানির বিশেষ সংস্কার সাধন করেন। 'বঙ্গদর্শন' হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ইহার রোহিণী ও গোবিন্দলালের চরিত্র পরিবর্ত্তিত করা হয়। প্রথম দিক্‌কার দুশ্চরিত্রা, লোভী রোহিণী পরবর্ত্তী সংস্করণে আশ্চর্য্যরকম বদলাইয়া গিয়াছে ; রোহিণী দুশ্চরিত্রা নয়, লোভী মোটেই নয়। গোবিন্দলালের চরিত্র 'বঙ্গদর্শন' এবং প্রথম তিন সংস্করণের পুস্তকে প্রায় অনুরূপ। চতুর্থ সংস্করণের শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র যে সংস্কার সাধন করিয়াছেন তাহাতে গোবিন্দলালের চরিত্রও পূর্ব্বাপর বদলাইয়া গিয়াছে। আগেকার গোবিন্দলাল আত্মহত্যা করিয়া মনের জ্বালা জুড়াইতে চাহিয়াছিল, শেষের দিক্‌টায় গোবিন্দলাল প্রায়শ্চিত্ত ও ভগবৎসাধনা দ্বারা শান্তি লাভ করে।" (ব-র ১, ভূমিকা শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল পৃ. ৩৯)। বলাবাহুল্য পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস ১২৮২ সালে পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুণ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মাঝে বঙ্গদর্শন প্রকাশ বন্ধ থাকে। পুনরায় ১২৮৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ক্রমশঃ প্রকাশের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। ১৮৭৮ সালে এই উপন্যাস প্রথম পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গোবিন্দলালের সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃ-প্রভাবজাত শিক্ষা ও বৃত্তি-অনুশীলনের পরিণাম। কিন্তু রোহিণীর পরিবর্তন আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। আজ বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষপাদে সমগ্র বিশ্বে যে নারী প্রগতি বা নারী সত্তার স্বীকৃতির আন্দোলন চলছে বঙ্কিম যেন শতবর্ষ আগে শক্তিরূপিণী, অহং সত্তায় বিশ্বাসী এক নারী মূর্তিকে কল্পনা করেছিলেন অথবা জীবনচর্চায় নর-নারী নির্বিশেষে উভয়ের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন।

রোহিণী বিধবা। সেকালের হিন্দুসমাজের বিধবা রমণীদের জীবনধারণ ও যাপন-প্রণালী দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে কতদূর বিচলিত করেছিল আমাদের সকলেরই জানা। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের পত্রালাপের মাধ্যমে এর আইনসম্মত অধিকারের দাবি তুলেছেন। কিন্তু আইন তো কাগজে লেখা বাক্য মাত্র, তাকে কার্যকরী করবে সমাজ। আজও হিন্দুসমাজ এ-আইন গ্রহণে বাধ্য হলেও মানসিক দিক দিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। রোহিণী এ উপন্যাসের নায়িকা শুধু নয়, একখানা ট্রাজেডির কেন্দ্রীয় চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর রূপবর্ণনার মাধ্যমে অতি সূক্ষ্ম শিল্পচর্চায় সেই ট্রাজিক

সূত্রটিকে তুলে ধরেছেন: ''রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। এ দিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদী বিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলেপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন।'' (ব-র ১, পৃ. ৫৪৩)। এই রূপবতী, গুণবতী, যৌবনবতী শিল্পীমনা মহিলা নিঃসঙ্গ আশ্রয়হীনা। তার দুর্ভাগ্য তাকে ব্রাহ্মণদের গৃহে পাচিকা ও সেবিকার বৃত্তিতে নিয়োজিত করেছে শুধুমাত্র আশ্রয় ও অন্নসংস্থানের জন্য। সুতরাং যার সব আছে সে কেন জীবনের সকল সুখ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে। এটা পুরুষশাসিত সমাজে কোন্ মহারথী প্রথা? এই প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও জেগে ছিল।

আমরা রোহিণীর সাক্ষাৎ প্রথম পাই ব্রহ্মানন্দের পাকশালায়। হরলাল পিতৃ উইল পরিবর্তনের জন্য তার দ্বারস্থ হলো। পূর্ব উপকার স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রত্যুপকার স্বরূপ সে রোহিণীকে উইল চুরির জন্য অনুরোধ জানালো। তাকে এক হাজার টাকার প্রলোভন দেখানো হল। উত্তর: ''টাকার প্রত্যাশা করিনা। কর্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিবনা। করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম।'' (ব-র ১, পৃ. ৫৪৪) অর্থাৎ রোহিণীর দারিদ্র্য চেতনা নেই, অর্থলোভ নেই, স্বভাগ্যকে সে সেদিক দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছে। সম্ভবত এদিক থেকে নিষ্ঠাবান সংযত চরিত্র গোবিন্দলাল রোহিণীকে ঠিকই চিনেছিল। উইল রেখে যাওয়ার সময় ধরা-পড়া-রোহিণীর কাছে গোবিন্দলাল যখন সকল বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন তখন রোহিণীর স্রষ্টার মন্তব্য পাই ''বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—কিন্তু যে জাতি জীয়ন্তে জলন্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়া—আর্য্যকন্যা।'' (ব-র ১, পৃ. ৫৫৮)

এখানে বঙ্কিমমানস আর আমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন রইল না। গোবিন্দলালের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য স্বয়ং লেখক রোহিণীর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। এক হরলালের মিথ্যাচার ও অপমানজনক উক্তি ''আমি যাই হই কৃষ্ণরায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিবনা। (ব-র ১, পৃ. ৫৪৭)''। রোহিণী নিজের সামাজিক অবস্থান উপলব্ধি করল। তাকে নিয়ে প্রেম প্রেম খেলা করা চলে কিন্তু গার্হস্থ্যজীবনে মর্যাদা দান করা যায়না। হরলালকে দূর করে দেবার পর, ''রাগে খোঁপাটা খুলিয়া গিয়াছিল। তার চোখে জল আসিতেছিল (ব-র ১, পৃ. ৫৪৭)।''

যে কামনা বাসনার কথা সে কখনও স্বপ্নে চিন্তা করেনি, হরলাল আত্মস্বার্থ সিদ্ধির জন্য তার সেই সুপ্ত বাসনাকে জাগিয়ে তুলল। 'বিধবা বিবাহ' হতে পারে তবে বিধবাকে ভালবাসতে বাঁধা কোথায়? দ্বিতীয়তঃ সামাজিক স্তরভেদ। ব্রহ্মানন্দের দাসী কখনও রায়বংশের বধূ হতে পারে না। দুঃখ বেদনা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি এবং সবার উপরে গোবিন্দলালের সহানুভূতি রোহিণীকে গোবিন্দলালের প্রতি আকৃষ্ট করল। ''গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে (ব-র ১, পৃ. ৫৫৯)।'' সম্ভবত উইল চুরি, প্রত্যর্পণ ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপের জন্য গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভুজঙ্গরূপে অখ্যায়িত করলেন অথবা দর্পণে তাঁর হৃদয়ের অসংযত প্রবৃত্তির রেখাপাতও ঘটেছিল।

এর পরের ঘটনা দ্রুত ধাবমান। গোবিন্দলাল-ভ্রমরের কথোপকথন, বালিকা ভ্রমরজীবনের জটিলতা উপলব্ধি না করলেও প্রাণ ভরা ভালবাসার মন্দাকিনীপ্রবাহ তার অজ্ঞাত নয়।

জ্ঞান হবার পর থেকে শাস্ত্রীয় ও গার্হস্থ্য ধর্মমতে গোবিন্দলাল তার হৃদয়সর্বস্ব। সুতরাং গোপনে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কৌশলে পরাজিত করবার মত শাণিত পরিণত বুদ্ধি তার নেই। বঙ্কিম তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত সরলা, পতিসর্বস্ব প্রেমিক সত্তা ভ্রমরের বুদ্ধি অনুযায়ী তার পথ নির্দেশ করেছেন। গোবিন্দলাল যখন রোহিণীর চেতনা ফিরিয়ে আনবার জন্য মুখে ফুঁ দিয়েছেন "সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।" (ব-র ১, পৃ. ৫৬৫) নাটকীয় 'আইরনীর' সূত্রপাত করলেন চতুর ঔপন্যাসিক।

রোহিণী ভাবল "রাত্রি দিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু এই জন্মে সেই জল স্পর্শ করিতে পারিবনা, আশাও নাই।"

অপরপক্ষে গোবিন্দলাল—বঙ্কিমচন্দ্রের মতে যার বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলন হয়নি। যে ধনীর ঘরে জন্মে সাধনার পূর্বেই সকল আরাধ্যকে পেয়েছে সে অন্তর্যামীর কাছে ফরিয়াদ জানাল, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!—তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইব?—আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব" (ব-র ১, পৃ. ৫৬৬)। আত্মসংযমের ও শুদ্ধির আশায় মেজোবাবু জমিদারী দেখতে দেহাত গেলেন। বিদায় চুম্বন লাভ করলে ও বালিকা ভ্রমর নিঃসন্দেহে এই সত্য উপলব্ধি করেছিল যে সে চুম্বনে হৃদয়ের উষ্ণতার অভাব আছে।

এরপর পাড়া কুঁদুলী মহিলাদের মুখে মুখে রটনা ভ্রমর ও রোহিণীকে মুখোমুখী করলো। লাঞ্ছিতা, অপমানিতা রোহিণী ভ্রমরকে আঘাত দিল। ভ্রমরের ঐশ্বর্য আছে, কুল সন্মান আছে, রোহিণীর রূপ যৌবন আছে। সুতরাং সে কেন পরাজয় মানবে, অভিমানিনী ভ্রমর গোবিন্দলালের প্রত্যাগমনের সংবাদে পিতৃগৃহে গমন করলেন। অন্তরে রুষ্ট, বিভ্রান্ত পতনোন্মুখ গোবিন্দলাল অধিক কষ্ট স্বীকার করলেন না। লেখক সম্মতি জানালেন, "রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপত মোহের জন্যই হইয়াছিল। (ব-র, পৃ. ৫৭৪)। দুর্বল গোবিন্দলাল মোহগ্রস্ত হলেন।

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু; সম্পত্তির অর্ধাংশ ভ্রমরকে দান গোবিন্দলালের প্রবৃত্তিতাড়নায় ইন্ধন যোগাল। আমরা জানি এ সম্পত্তি গোবিন্দলালের হাতে থাকলেও পরিণাম একই হতো। কামনাসক্ত পুরুষ পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা এক কালের খেলার পুতুল ভ্রমরের সামনে ভাবলেন, "এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি; এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব। আমার এই অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।" (ব-র ১, পৃ. ৫৭৮)। গোবিন্দলালের এই সংলাপ অতি নাটকীয়, তবে এর ভিতরে কৌশলে ঔপন্যাসিক তার পরিণামের বীজ বপন করেছেন। কারণ পরিণামে গোবিন্দলালের আত্মহত্যা ও সন্ন্যাসগ্রহণ যে কোনও সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত এই উক্তি আমাদের দেয়।

গোবিন্দলাল কাশীধাম থেকে প্রসাদপুরে আনন্দধামের আয়োজন করলেন। রোহিণীকে নিয়ে সংসারধর্ম পালন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলনা। তিনি নগেন্দ্রনাথের মত তাকে বিয়ে করে সামাজিক জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের মত গোবিন্দলাল ধীশক্তিসম্পন্ন নন। প্রথম থেকেই তিনি আবেগতাড়িত। তাই বাইজিগৃহের পরিবেশ

আমরা প্রসাদপুরের কুঠিতে পাই। রোহিণীর সঙ্গীতচর্চা এবং গোবিন্দলালের উপন্যাস-পাঠের ভিতর দিয়ে এঁরা আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। সেখানে অশ্লীল বা নিন্দনীয় কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। কন্যার চরম দুরবস্থা দেখে মাধবীনাথ নিশাকরের শরণাপন্ন হলেন। নিশাকর বন্ধুকৃত্যের জন্য যা প্রয়োজন অবলীলায় সবই করে গেলেন। কৈশোরের ধারণা ছিল নিশাকরের পটল চেরা চোখ দেখে রোহিণী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? হয়তবা শেষপরিণামের প্রস্তুতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি ছত্র রচনা করেছেন: "রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিতেছিল, "এ কে? দেখিয়াই বোধ হইতেছে যে, এদেশের লোক নয়। বেশভূষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে যে, বড় মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়। গোবিন্দ-লালের রঙ ফরসা কিন্তু—এর মুখ চোখ ভাল। বিশেষত চোখ—আ মরি! কি চোখ! এ কোথা থেকে এলো? হলুদগাঁয়ের লোক ত নয়—সেখানকার সবাইকে চিনি। ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই না? ক্ষতি কি—আমি যে কখনও গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাস-ঘাতিনী হইবনা।" (ব-র ১, পৃ. ৫৮৯)। রোহিণীর উচচারিত শেষ সংলাপ আমাদের বিস্মিত করে। কারণ তার প্রণয়নিষ্ঠা তো ভ্রমরের চেয়ে কম নয়। দীর্ঘ দিনের নিঃসঙ্গ একটি নারী ও একটি পুরুষের সহবাস ক্লান্তি আনে। এই সত্য আশা ও মহেন্দ্র সম্পর্কে বিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথও উচচারণ করেছেন। কিন্তু রোহিণী-চরিত্রে আমরা সে আভাস পাই না। নিশাকর তাকে জানিয়ে ছিল রোহিণীকে তার খুড়ার সংবাদ দিবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক আমাদের নিস্পৃহ ও সহানুভূতিভাবাপন্ন থাকতে দিতে চাননি। কারণ পরবর্তীতে রোহিণীকে যে শাস্তি দেওয়া হবে তার জন্য পাঠকের মানসিক প্রস্তুতি আবশ্যক। তাই চিত্রার বাঁধাঘাটে যাবার আগে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "রোহিণী দেখিয়াছিল যে, নিশাকর রূপবান্—পটলচেরা চোখ। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে ধীর সঙ্কল্প ছিল যে, আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না। কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা—আর এ আর এক কথা। বুঝি সে মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, "অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?" ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে? বাঘ গোরু মারে,—সকল গোরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য। অনেকে মাছ ধরে—কেবল মাছ ধরিবার জন্য, মাছ খায় না, বিলাইয়া দেয়—অনেকে পাখী মারে, কেবল মারিবার জন্য—মারিয়া ফেলিয়া দেয়। শিকার কেবল শিকারের জন্য—খাইবার জন্য নহে। জানি না, তাহাতে কি রস আছে। রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর-কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই। জানি না, এই পাপিয়সীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল—কিন্তু রোহিণী স্বীকৃত হইল যে, প্রদোষকালে অবকাশ পাইলেই, গোপনে চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়া খুল্লতাতের সংবাদ শুনিবে।" (ব-র ১, পৃ. ৫৯৩)।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিত, ধীশক্তিসম্পন্ন, দার্শনিক এবং মনস্তত্ত্ববিদ। কিন্তু উপ-রোক্ত উদ্ধৃতি তাঁর কোন্ গুণের ওপর ভিত্তি করে বিচার করবো সে সম্পর্কে আমার দ্বিধা আছে। তিনি মানবকল্যাণে বিশ্বাসী। কোঁতের শিষ্য, রোহিণীকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিলে যদি greatest good of the greatest number হয়, দার্শনিক নীতিপরায়ণ বঙ্কিম সন্তুষ্ট হ'ন আমার আপত্তি নাই। কিন্তু ব্যাধের ধর্ম আর নারীর ধর্ম যদি এক হয় তা হলে প্রসাদপুরের কুঠিতে গোবিন্দলাল রোহিণীকে বেঁধে রাখতে পারতেন না। ভাল হোক মন্দ হোক আমরা তাকে প্রসাদপুর বাজারে গণিকালয়ে দেখতে পেতাম। কারণ এ প্রবৃত্তির তাড়না, ঐশ্বর্যের লোভ নয়।

সম্ভবত রোহিণীকে অপাপবিদ্ধা অবস্থায় বঙ্কিম হত্যা করতে পারেননি বা তাঁর মানসকন্যার জন্য যে মমত্ববোধ ছিল তজ্জনিত কারণে এ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাই মরবার মুহূর্তে তার আর্তনাদ শুনি : "মারিও না, মারিও না ! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিবনা। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না ! (ব-র ১, পৃ. ৫৯৫)।

এর পরবর্তী কাহিনী যেন রক্ষণশীল সমাজকে উপহার দেবার জন্যই রচিত হয়েছে। ভ্রমরের সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, তার প্রথম জীবনের আচরণের সঙ্গে নিঃসন্দেহে আপাত বিরোধী। কারণ যেদিন সে গোবিন্দলালের প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেদিন থেকে গোবিন্দলাল তার কাছে মৃত। শুধু আত্মঅহঙ্কারে, ব্যক্তিত্ব-বিকাশে ভ্রমর সর্ব-শ্রদ্ধেয়া। গোবিন্দলালের পায়ের ধুলা মাথায় না নিলেও স্বর্গারোহণে তাঁর কোনও প্রতি-রোধ সৃষ্টি হত না। তবে বঙ্কিমের সমকালীন সমাজ ছিল বড় কঠিন। তাই স্বামীর চরণ-ধূলি গ্রহণে ভ্রমরের দেহত্যাগ, গোবিন্দলালের সন্ন্যাস। যদিও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে ভ্রমর ও রোহিণীর একটি তুলনা মনের মধ্যে চিত্রিত করেছেন গোবিন্দলাল যা সম্ভবতঃ পরবর্তী-কালে শরৎচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল দেবদাস-চরিত্র সৃষ্টিতে। দেবদাসে মৃত্যুপথ যাত্রা-কালে চোখের সামনে মায়ের মুখের পাশে কখনও চন্দ্রমুখী কখনও পার্বতীকে দেখেছিল। তবে চন্দ্রমুখী নিঃসন্দেহে স্পষ্টতর। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক জ্ঞানগর্ভ বাক্য উচ্চারণ করেছেন। কেননা রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, "···স্নেহময়ী, রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চর-মোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া ; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া। আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত ?" (ব-র ১, পৃ. ৬০৩)। এ গোবিন্দলালের ভ্রমর সম্পর্কিত খেদোক্তি, কিন্তু দার্শনিক বঙ্কিমের এ-উক্তি শুধু ভ্রমর সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে কেন? রোহিণীও কি দেবতার ছায়া নয়? তা হলে সে হরলালকে ফিরিয়ে দিল কি করে? কেমন করে দরিদ্র হতভাগিনী পরাশ্রিতা একহাজার টাকার লোভ সম্বরণ করলো ? সে তো গোবিন্দলালকে প্রলোভিত করে প্রসাদপুরে নিয়ে যায়নি। পতঙ্গ বহ্নিমুখে ঝাঁপ দেবার জন্য স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধনী, শিক্ষিত, রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান। ধর্মে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। তাই অর্থভিত্তিক অভিজাত পূজিত সমাজে ভ্রমরের জন্য স্বর্ণমূর্তি তৈরী করে শচীকান্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন আর প্রসাদপুর কুঠির ভৃত্যবর্গ দেখল "বালক-নখর-বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে", (ব-র ১,পৃ. ৫৯৬)। এর পরও আছে, "পরে রোহিণীর মৃতদেহ বান্ধিয়া ছাঁদিয়া গোরুর গাড়িতে বোঝাই দিয়া, চৌকি-দারের সঙ্গে ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন।" (ব-র ১, পৃ. ৫৯৬)।

পরবর্তীতে আমরা বিনোদিনী ও কিরণময়ীর সঙ্গে যখন রোহিণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জীবনের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করব তখন মনে হবে বঙ্কিম সর্বাধিক রমণীপ্রিয় অর্থাৎ রমণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রোহিণীর রূপ ছিল, গুণ ছিল, কিন্তু ধনজনের ক্ষেত্রে তার স্থান ছিলনা। একমাত্র এই দারিদ্র্যের কারণেই সে জীবনে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হলো। ভ্রমর কৃষ্ণকান্তের পুত্রবধূ—গোবিন্দলালের পত্নী এবং মাধবীনাথের কন্যা তাই সে স্বর্ণমূর্তি শোভিতা হয়ে মন্দিরে দেবীরূপে পূজিতা।

তবুও বলব বঙ্কিমমানস তুলনামূলকভাবে দেশ, কাল ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বলিষ্ঠ। উন্মাদিনী হীরা, কুন্দ সকলেরই বঞ্চনার ইতিহাসের মূলে দারিদ্র্য ও সামাজিক স্তরের ব্যবধান। সেদিন সমাজের জন্য ব্যক্তি বলীদানপ্রথা এদেশে প্রচলিত ছিল। অসমসাহসী মানসিকতার অধিকারী বঙ্কিম তাঁকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও

স্বহৃদয় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আজ শতবর্ষ পরে যুগের দাবীতে রোহিণী, হীরা, কুন্দ কেউই অপাংক্তেয় নয়। এঁরা পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা করেন নি, কারণ এঁদের স্রষ্টা এদের বাঁচবার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন সমাজের অলক্ষ্যে রসিক হৃদয়ে।

১২৮২ সালে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্গদর্শনে আত্মপ্রকাশ করে। আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি যে বঙ্গদর্শন কিছু কাল বন্ধ থেকে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে এবং বঙ্কিমের উপন্যাস খানা সমাপ্ত হয়। পরবর্তী আত্মপ্রকাশে রবীন্দ্রনাথ জড়িত হলেন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, "কোনো পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা, আমার মনে এই সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ-অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানে প্রায়ই আমি জয়লাভ করতে পারি নি, এবারও তাই হল।" (সূচনা : চোখের বালি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, সংস্করণ ১৯৭৫)।

রবীন্দ্রনাথের কাছে উপন্যাসের আবেদন এল। কবি জানাচ্ছেন : "এর পূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দিই নি। ছোটো গল্পের উল্‌কাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা-ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত এখনো হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে।" (র-র ৩, সূচনা)। সবশেষে 'চোখের বালি'র নূতনত্ব ও নবরূপায়ণের দিক নির্দেশ করে ঔপ-ন্যাসিক বলেছেন, "চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অব-স্থায় এমন করে দাঁত-নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেড়িয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।" (র-র ৩, সূচনা)।

১৩০৯ সালে 'চোখের বালি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৮ সালে। কালের দিক দিয়ে একত্রিশ বছরের ব্যবধান। নব-গঠিত সামন্তবাদী সংস্কৃতিচর্চাসম্পন্ন কলিকাতা মহানগরীর জীবনদর্শনে এ সময়ের ব্যবধান কম কথা নয়। বঙ্কিমঅনুসৃত সমাজজীবনে ভাঙ্গন ধরেছে। এখন সমাজ বড় নয়, ব্যক্তি তার চেয়ে বড়। গোবিন্দলাল রোহিণীকে নিয়ে প্রসাদপুরে গিয়েছিল সামাজিক অনুসাশন ও নিজস্ব বিবেকের অপরাধবোধ নিয়ে। কিন্তু মহেন্দ্র স্বগৃহে আশার সামনে বিনোদিনীর প্রেম প্রার্থনা করেছে। গোবিন্দলালের মত মহেন্দ্রের মনেও সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব ছিল। সে দ্বন্দ্বে গোবিন্দলাল কুমতির কাছে পরাজিত হয়ে 'রূপের সেবা' করতে গেছেন। কিন্তু মহেন্দ্রের জীবন-যাত্রা পৃথক। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনী, মহেন্দ্র ও বিহারীর ত্রিকোণ প্রেমের জন্য দায়ী করেছেন মহেন্দ্র-জননীর অতি পরিমাণ কেঙ্গারু শাবকের মতো বক্ষলগ্ন অন্ধ মাতৃস্নেহকে। গোবিন্দলাল-জননী নাটকে পশ্চাতপটে বিদ্যমান। তবুও গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। উভয়ের ক্ষেত্রে একটি সত্য এবং সমর্মিতা বিদ্যমান তা হল উভয়ের ক্ষেত্রে প্রেমিক সত্তা বালিকাবধূ। সখা ও সচিবকে তারা স্ত্রীর ভেতর পাননি। উভয়ের সেই সখা সচিবের সন্ধানে ছুটেছেন। আমাদের জনৈক বিদেশী বন্ধু বলতেন—যদি কখনও বিয়ে করি বিধবা বিয়ে করব কারণ বিবাহিতা জীবনে প্রেমের আর্টে তাঁরা অভিজ্ঞ ও পারদর্শিণী। সম্ভবত বিনোদিনী ও রোহিণীর ভেতর সেই গুণ তাদের প্রেমাস্পদকে আকর্ষণ করেছে।

কিন্তু রোহিণী-চরিত্র স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। তার প্রণয়, অবৈধ জীবনযাত্রা সবই অত্যন্ত সহজ ছকবাঁধা নিয়মে এগিয়ে গেছে, কারণ তৎকালীন সামাজিক অনুশাসন। তা ছাড়া

রোহিণী পরিপূর্ণ যৌবনা, প্রেম বুভুক্ষু। হরলালের কাছ থেকে অপমানিত না হলে সম্ভবত সে কুগ্রহের মত গোবিন্দলালের জীবনে অভিসম্পাত কুড়াতোনা। সুতরাং এক লিবিডো ভারাতুরা রমণী আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে গোবিন্দলালকে অবলম্বন করেছে। সেখানে গোবিন্দলালও যথেষ্ট সক্রিয়।

কালের ব্যবধানে এবং ঔপন্যাসিকের নব চেতনায় 'আঁতের কথা' বের করে দেখাতে গিয়ে তিনি বিনোদিনীকে কখনও সেবাময়ী দেবী, কখনও অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা, কখনও পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা প্রেমিকা দাসী আবার কখনও ঈর্ষাকাতর সর্পিনীর মত করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

রোহিণী ভ্রমরকে ঈর্ষা করেছে দূর থেকে কারণ তার বিশ্বাস ভ্রমর তার নামে মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে। না হলে হয়ত দুইজনে কখনও সাক্ষাৎ হতো না। এরা পরস্পরের নামও উচ্চারণ করেনি। একমাত্র ভ্রমর তৃতীয় ব্যক্তির সামনে তাকে 'দড়ি-কলসীর বিধান' দেওয়া ছাড়া। ভ্রমর সম্পর্কে রোহিণী নীরব, তার নাম উচ্চারণের স্পর্ধা রোহিণীর ছিলনা। সে যা পেয়েছিল তাতেই তুষ্ট। রোহিণী গ্রাম্য বিধবা, অল্প লেখা-পড়া জানা, বহির্বিশ্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা।

কিন্তু 'চোখের বালি'র নায়িকা মিশনারী মেমদের কাছে লেখাপড়া শিখেছে, বহু গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা পাঠ করেছে, বঙ্কিম দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীর অবস্থানও জানত। বাইরের জগৎ সম্পর্কে তার ঔৎসুক্য সীমাহীন। দুর্ভাগ্যক্রমে মহেন্দ্রের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন জননী রাজলক্ষ্মী। কিন্তু মহেন্দ্র সম্মত হয়নি। ফলে বৃদ্ধ পতির অকাল মৃত্যু। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা "তাহার মৃত্যুর পর হইতে বিনোদিনী, জঙ্গলের মধ্যে একটিমাত্র উদ্যানলতার মতো, নিরানন্দ পল্লীর মধ্যে মুহ্যমানভাবে জীবন যাপন করিতেছিল। অদ্য সেই অনাথা আসিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী পিস্‌শাশ্‌ঠাকরুনকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং তাঁহার সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া দিল।" (র-র ৩, পৃ. ৩০৬)।

এ দিকে মায়ের ও কাকির ঝগড়ার ফলে কলিকাতার গৃহ অগোছাল হয়ে পড়লো। আশা নিজেকে বিপন্নবোধ করতে লাগলো। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন, "সংসারের কঠিন কর্তব্য হইতে প্রেমকে ফুলের মতো ছিঁড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইলে, তাহা কেবল আপনার রসে আপনাকে সজীব করিতে পারে না, তাহা ক্রমেই বিমর্ষ ও বিকৃত হইয়া আসে" (র-র ৩, পৃ. ৩১০)। অর্থাৎ বিনোদিনী আসবার আগেই তাকে আহ্বান জানাবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। পিঞ্জরের ভেতর অবস্থিত পোষা কোকিলের মৃতদেহ আমাদের একটি সুন্দর প্রতীক ব্যঞ্জনা দান করেছে এখানে।

রোহিণীর ঈর্ষা আর বিনোদিনীর ঈর্ষার রূপ ভিন্ন। আগেই উল্লেখ করেছি রোহিণীর কামোন্মত্ত যৌবন একটি সঙ্গী কামনা করেছিল। বিনোদিনী শিক্ষিতা তাই দেহ থেকে তার মন প্রাধান্য পেয়েছে। উপরন্তু বিংশ শতাব্দী শুরু হলেও বাস্তব চরিত্র ক্ষেত্রে তখন অর্থ প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। ঔপন্যাসিকেরা রাজারাজড়ার দরবার ছেড়ে সমতল ভূমিতে নেমে এসেছেন। স্বয়ং বঙ্কিমও এর ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে এই নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। এখানেই তাঁর ধীশক্তি ও মননশীলতা সাধারণ এক বঞ্চিতা নারীর হৃদয়ের দ্বার আগল মুক্ত করেছে। "তা তো হইতই। না হইল কেন। আশার এই বিছানা, এই খাট তো একদিন তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল। বিনোদিনী এই সুসজ্জিত শয়নঘরের দিকে চায়, আর সে কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। এ ঘরে আজ সে অতিথিমাত্র—আজ স্থান পাইয়াছে, কাল আবার উঠিয়া

যাইতে হইবে।'' (র-র ৩, পৃ. ৩১৭)। আমার মনে হয় বিনোদিনী-চরিত্র বিশ্লেষণে এই অংশটুকু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

নিজের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তাবোধ ক্রমশঃ তাকে আশার উপর বিরূপ করে তুললো। এতে ইন্ধন যোগালো আশার প্রতি বিহারীর দুর্বলতা। ঘটনাটা তার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ালোনা। বিনোদিনী ভাবলো জগতে সবাই আশার অথচ সে নির্বোধ বালিকা মাত্র। আর সর্বগুণে গুণান্বিতা বিনোদিনী সংসারে সর্বসুখ বঞ্চিতা, পরভৃত্তিকা মাত্র। কেন? বিহারী দূর থেকে বিনোদিনীকে লক্ষ্য করেছে। সে বুদ্ধিমান, মানবচরিত্র সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা আছে বলেই তার বিশ্বাস, তাই ''বিহারী এটুকু বুঝিয়াছে, এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা একভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জ্বলে, আর এক ভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়।'' (র-র ৩, পৃ. ৩১৯)। বিহারীর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো।

বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ থাকলেও মহেন্দ্রের কাছে সেটা উচিত মনে হয়নি। কিন্তু অন্তরালে বিনোদিনী ভেবেছে, ''আমি কি মানুষ না। আমি কি স্ত্রীলোক নই। একবার যদি আমার পরিচয় পাইত, তবে আদরের চুনির সঙ্গে বিনোদিনীর প্রভেদ বুঝিতে পারিত।'' (র-র ৩, পৃ. ৩২২)। দক্ষ রূপকার সফল বিনোদিনীর নামকরণ করেছিলেন কারণ বিনোদ নামক চুম্বকশক্তি যে তাতে বিদ্যমান বিনোদিনী কখনও তা বিস্মৃত হয়নি বরং সময়মত কাজে লাগিয়েছে।

বিহারী কর্তৃক মহেন্দ্র-সংসারের কল্যাণ কামনা বিনোদিনীর পরবর্তী কর্মপন্থাকে দ্রুতান্বিত করেছে। আশা, বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের মেলামেশা বিহারী ভাল চোখে দেখেনি কারণ আবেগ-প্রবণ মহেন্দ্রকে সে শৈশবকাল থেকে চেনে। তাই বলেছে, ''মহিনদা, নিজের সর্বনাশ করিতে চাও, কর—বরাবর তোমার সেই অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে সরলহৃদয়া সাধ্বী তোমাকে একান্ত বিশ্বাসে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার সর্বনাশ করিয়ো না। এখনো বলিতেছি, তাহার সর্বনাশ করিয়ো না।'' (র-র ৩, পৃ. ৩৩২)। পরবর্তীকালে বিহারীর এই আচরণ মহেন্দ্রের কাছে আশার প্রতি অবৈধ প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

তারপর দমদমের চড়ুই ভাতি আমাদের কাছে বিনোদ প্রেমের এক নব প্রেক্ষাপট উত্তোলন করলো। বিহারী বিনোদিনীর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে তাকে শ্রদ্ধার আসনে বসালেন, হয়তবা কন্দর্প দেবও সেখানে কিছুটা স্থান করে নিলেন।

এরপর বিহারীকে তুষ্ট করবার জন্য বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করল। সেই বিহারীর শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রেম লাভ করেছে এতেই তার নারী সত্তা পরিপূর্ণ। বিহারী স্থির, ধীর, বুদ্ধিমান, সংযত। ব্রততী একমাত্র মহাবৃক্ষকেই অবলম্বন করতে পারে। এখানে বিনোদিনীর সম্মানের ও সম্ভ্রমের আসন প্রতিষ্ঠায় বাধা নেই।

কিন্তু বঙ্গদর্শনের ঔপন্যাসিক বিনোদিনীর চরিত্রের পাপড়ি একটি একটি করে উন্মোচন করলেন ''যে-মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, যে-মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রীরত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণবুদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাসে কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে না তাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের, না দুয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না। মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে 'কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা

বুঝিতেই পারিলাম না।" (র-র ৩, পৃ. ৩৪৬-৪৭)। তাই "বিহারী অন্ধকারে বিনোদিনীর মুখ দেখিতে পাইল না, সে মুখে হিংসার বিদ্যুত খেলিতে লাগিল।" (র-র ৩, পৃ. ৩৪৮)। সে বিহারীকে সান্ত্বনা দিল "আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, বিহারীবাবু। আমার চোখের বালির জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া নিজেকে বেশী কষ্ট দিবেন না।" (র-র ৩, পৃ. ৩৪৯)।

উপন্যাসের গতি এখান থেকেই ভিন্ন পথ গ্রহণ করলো। ঈর্ষান্ধ বিনোদিনী মহেন্দ্রকে পত্রযোগে আকৃষ্ট এবং আহ্বান জানালো। মূর্খ মহেন্দ্র চরিত্ররক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আত্মনিপীড়ন করেও শেষপর্যন্ত বিহারীর হাত ধরে ঘরে ফিরে এলো। তার মনের অবস্থা তখন এ পৃথিবীতে বিনোদিনী বলে কেউ কখনও ছিল না, থাকলেও ভবিষ্যতে তাকে থাকতে দেওয়া হবেনা। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মহেন্দ্র কাশীতে অন্নপূর্ণার দ্বারস্থ হলো, কিছুদিন তার স্নেহ লালিত মহেন্দ্র ভাবল "আশাকে আমার হৃদয় হইতে একচুল সরাইয়া বসিতে পারে, এমন তো আমি কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইনা।" (র-র ৩, পৃ. ৩৬৫)। কাশীর গঙ্গায় অবগাহন করে পূত পবিত্র মহেন্দ্র ঘরে ফিরে এলো।

প্রথম দর্শনে মাসিমার কথা শুনে আশার হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার দেখে মহেন্দ্র তাকে কাশীতে পাঠানোর জন্যে প্রস্তুত হলো। বিহারী বিপদ বুঝে সঙ্গে বিনোদ-বৌঠানকে নেবার প্রস্তাব দিতেই মহেন্দ্রের পশুসত্তা হিংস্রমূর্তিতে প্রকাশিত হলো! "বিহারী, তোমার মনের ভিতর যে-কথাটা আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলো। আমার সঙ্গে অসরলতা করিবার কোনো দরকার দেখি না। আমি জানি, তুমি মনে মনে সন্দেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি। মিথ্যা কথা। আমি বাসি না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হইবে না। তুমি এখন নিজেকে রক্ষা করো। যদি সরল বন্ধুত্ব তোমার মনে থাকিত, তবে বহুদিন আগে আমার কাছে তোমার মনের কথা বলিতে এবং নিজেকে বন্ধুর অন্তঃপুর হইতে বহুদূরে লইয়া যাইতে। আমি তোমার মুখের সামনে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি আশাকে ভালবাসিয়াছ।" (র-র ৩, পৃ. ৩৬৭)। বিনোদিনী জানলো "বিনোদিনীকে কেহই ভালোবাসেনা বটে! সকলেই ভালোবাসে এই লজ্জাবতী ননীর পুতুলটিকে।" (র-র ৩, পৃ. ৩৬৮)। বিনোদিনী পত্রে বিহারীকে সব কথা জানাতে চেষ্টা করল কিন্তু মহেন্দ্রের ঈর্ষা ও নীচতা অন্তরায় হলো। সুতরাং একদিকে মহেন্দ্রের মুখে স্পষ্ট উচ্চারিত প্রত্যাখ্যান অপরদিকে বিহারীকে লেখা খোলা চিঠি প্রত্যার্পণ বিনোদিনীর অন্তরে ঈর্ষার কাল সর্পকে জাগ্রত করে তুললো, ঔপন্যাসিক এই অবস্থার বর্ণনায় লিখেছেন, "ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্রুদ্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে যাহা চায় তাহাতেই বাধা? কোনো কিছুতেই কি সে কৃতকার্য হইতে পারিবে না। সুখ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে পরাস্ত ধূলিলুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনে কর্ম সমাধা হইবে। (র-র ৩, পৃ. ৩৭৪)।

এ বিনোদিনী আমাদের মর্মমূলে নাড়া দেয়। সত্যই কুবের অথবা কন্দর্প অথবা উভয়ে মিলিত ষড়যন্ত্রে এক আশ্রয়হীনা দরিদ্র বঞ্চিত গুণবতী, রূপবতী নারীর জীবনে এ কোন্ অবমাননা!

স্রোতস্বিনীর স্বাভাবিক গতিধারাকে রুদ্ধ করলে সে বাঁকা পথে যাবেই। সুতরাং আশা কাশী গেলে বিনোদিনী তার সর্বশক্তি দিয়ে মহেন্দ্রকে নিয়ে খেলতে বসলো। আবেগপ্রবণ

মহেন্দ্র অল্পেই আত্মসমর্পণ করলো। দুই হাতে বিনোদিনীর পদপ্রান্তে পতিত মহেন্দ্রকে অকস্মাৎ বিহারী দেখতে পেল। বিনোদিনীর প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা মুহূর্তে ঘৃণায় পর্যবসিত হলো, বিহারীকে বোঝাবার চেষ্টা করতে গিয়ে বিহারীর হাতের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেল। বিনোদিনী আঘাত পেল। পরবর্তীকালে একই দৃশ্য আমরা চরিত্রহীনে কিরণময়ী ও উপেন্দ্রের জীবনে দেখতে পাই। আমরা যা দেখি তা কতটুকু সত্যি ? বাইরের আচরণ দিয়েই তো বিচার করি। অন্তরের সংবাদ তো একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। এখানে অবশ্য রাজলক্ষ্মীও কিছুটা ইন্ধন যোগালেন। এর প্রয়োজন ছিলনা কিন্তু বাহ্যিক ঘটনাকে দ্রুতগতি দান করতে সক্ষম হলো। বিনোদিনী যে বিহারীকে ভালবেসেছিল এ তার অন্তরের ধ্রুব সত্য। সুতরাং রাজলক্ষ্মীকে দিয়ে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করান হলো। মহেন্দ্র ক্ষুব্ধ হলেও সে তো মণিহীন ফণী। যাবার সময় জানতে পারলো 'সেদিন বিনোদিনীর একাদশী।' এই একাদশীর বাহুল্য আমরা পরবর্তীতে শরৎচন্দ্রে পেয়েছি। কিন্তু এই সংবাদে ''নিষ্ঠুর বিদ্রূপের একটি সূক্ষ্ম হাস্যরেখা বিহারীর ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিল—তাহার অর্থ এই যে একাদশী-করাও আছে। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই।'' (র-র ৩, পৃ. ৪০২) প্রকৃতপক্ষে এখানেই দু জনের বন্ধুত্বের সমাপ্তি এবং প্রকাশ্যে বিহারীকে মহেন্দ্র তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলো।

মাসিমার কাছ থেকে অনেক তত্ত্বকথা শুনে আশা ভাঙ্গা সংসারে আবার ফিরে এলো। কারণ আশা ভ্রমর নয়। ভ্রমর এ ক্ষেত্রে প্রেমের অবমাননায় হয়ত কাশিবাসী হতো। শেষ পর্যন্ত আশাকে সর্বশক্তি দিয়ে তার রূপকার কিছুটা মানসিক স্থৈর্য ও বলদানের চেষ্টা করেছেন কিন্তু মহেন্দ্রের অঙ্গুলি হেলনে সে তার অঙ্কশায়িনী হয়েছে। অবশ্য অতিনগণ্য দু একটি ব্যতিক্রম হয়তো আছে। শেষপর্যন্ত মহেন্দ্রকে লেখা বিনোদিনীর প্রেম-প্রত্যাখান পত্র আশা পেলো। সবকথা জানাজানি হলে বিনোদিনীকে ও বাড়ির পাট চুকিয়ে দিতে হবে। যে রাজলক্ষ্মী তাকে কন্যাস্নেহে ঘরে এনে পুত্রবধূকে জব্দ করতে চেষ্টা করেছিলেন তিনিও বিনোদিনীকে ধিক্কার দিলেন। বিনোদিনী বিহারীর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করল। অকপটে বলল ''তোমার কাছে লুকাইব না, এ-সমস্তই আমারই কাজ। আমি মন্দ হই যা হই, একবার আমার মতো হইয়া আমার অন্তরের কথা বুঝিবার চেষ্টা করো। আমার বুকের জ্বালা লইয়া আমি মহেন্দ্রের ঘর জ্বালাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল, আমি মহেন্দ্রকে ভালোবাসি, কিন্তু তাহা ভুল (র-র ৩, পৃ. ৪২১)''। কিন্তু বিহারী ঘৃণামুক্ত হতে পারলনা। বলল ''হাঁ নাটক, নভেল। তাও খুব উঁচুদরের নয়। তুমি মনে করিতেছ, এ-সমস্ত তোমার নিজের—তাহা নহে। এ-সবই ছাপাখানার প্রতিধ্বনি। যদি তুমি নিতান্ত নির্বোধ মূর্খ সরলা বালিকা হইতে, তাহা হইলেও সংসারে ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে না—কিন্তু নাটকের নায়িকা স্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলেনা।'' (র-র ৩, পৃ. ৪২৩)। উজাড় করে যে প্রেম বিনোদিনী দিতে এসেছিল, তার পরিবর্তে চরমতম অপমান ও অবমাননা মাথায় নিয়ে বিহারীর নির্দেশে স্বগ্রামে ফিরে গেল।

কিন্তু পল্লীর সমাজজীবন ও দারিদ্র্য তাকে অহরহ লাঞ্ছিত করতে লাগলো। উপরন্তু নিজে চেষ্টা করেও পল্লীবাসীদের কাছ থেকে নির্লিপ্ত থাকতে পারলনা। তার কলঙ্কের কথা সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেল। উদ্ধার পাবার জন্য বিহারীকে পত্র লিখল কিন্তু পরিবর্তে মহেন্দ্র এসে হাজির হল।

মহেন্দ্র বিনোদিনীকে নিয়ে পটলডাঙ্গার বাসায় উঠলো। আজ বাইরের কোন বাধা নেই তাদের মিলনে কিন্তু ''কোনো বাধা যে নাই, তাহাই সর্বাপেক্ষা বড়ো বাধা, আজ মহেন্দ্র নিজেই নিজের বাঁধা।'' (র-র ৩, পৃ. ৪৪৫)।

বিনোদিনী অনেক চেষ্টা করেও বিহারীর সঙ্গে যোগাযোগে ব্যর্থ হলো, ওদিকে "…জীবনের পঙ্কশয্যায় ঘৃণা এবং আসক্তির মধ্যে যে প্রাত্যহিক লড়াই হইতে থাকিবে, তাহা অত্যন্ত বীভৎস। বিনোদিনী স্বহস্তে সচেষ্টায় মাটি খুঁড়িয়া মহেন্দ্রের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই যে একটা লোলজিহ্বা লোলুপতার ক্লেদাক্ত সরীসৃপকে বাহির করিয়াছে, ইহার পুচ্ছপাশ হইতে সে নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে।" (র-র ৩, পৃ. ৪৬৬)। পরবর্তীকালে কিরণময়ী দিবাকরের শিষ্য গুরুর এ বচন গ্রহণ করেছেন।

রাজলক্ষ্মী গুরুতর পীড়িতা, উপায়ন্তর না দেখে নবীনের ওপর দায়িত্ব দিয়ে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে নিয়ে কলিকাতা ত্যাগ করলো। বহু জায়গা ভ্রমণের পর তারা এলাহাবাদে এসে উপস্থিত হলো এবং বিহারীর পরিত্যক্ত গৃহে মহেন্দ্রের অজ্ঞাতে বিনোদিনী আশ্রয় গ্রহণ করলো।

এদিকে বিহারীও বিনোদিনীর চিন্তা করে। উপলব্ধি করে সে বিনোদিনীকে ভালবাসে শ্রদ্ধা করে। "কিন্তু তবু সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে বিহারী আজ এমন দূরে রহিয়াছে কেন। তাহার কারণ এই, বিনোদিনী যে-সৌন্দর্য রসে বিহারীকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে, সংসারের মধ্যে বিনোদিনীর সহিত সেই সৌন্দর্যের উপযুক্ত কোনো সম্বন্ধ সে কল্পনা করিতে পারে না। পদ্মকে তুলিতে গেলে পঙ্ক উঠিয়া পড়ে। কী বলিয়া তাহাকে এমন-কোথায় স্থাপন করিতে পারে, যেখানে সুন্দর বীভৎস হইয়া না উঠে।" (র-র ৩, পৃ. ৪৭৭)

এমন সময়ে অন্নপূর্ণা এলেন। গঙ্গাতীরে বিহারীর নির্জন দরিদ্রসেবা কেন্দ্র থেকে রাজলক্ষ্মীর অসুস্থতার খবর দিয়ে কলকাতায় নিয়ে গেলেন। বিহারী সব শুনলো। তার পর মহেন্দ্রকে মৃত্যুপথযাত্রী জননীর সংবাদ দেবার জন্য তার ঠিকানা যোগাড় করে পথে বেরুলো।

সৌখীন বিনোদিনীকে প্রবাস যাত্রার সময় ইণ্টারমেডিয়েট ক্লাসে উঠতে দেখে মহেন্দ্র অবাক হলে। কারণ একটি সত্য মহেন্দ্র অনুধাবন করতে পেরেছিল : "পূর্বে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ তাহার কাছে প্রীতিকর ছিল না ; নিজের সাংসারিক দৈন্য সে নিজের পক্ষে অপমানকর বলিয়াই মনে করিত। মহেন্দ্র এটুকু বুঝিয়াছিল যে, মহেন্দ্রের ঘরের অজস্র সচ্ছলতা, বিলাস উপকরণ এবং সাধারণের কাছে ধনী বলিয়া তাহাদের গৌরব, এককালে বিনোদিনীর মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল।" (র-র ৩, পৃ. ৪৮৩)। মহেন্দ্রের এই উক্তি দিবালোকের মতো সত্য। কিন্তু ঘর ছেড়ে মহেন্দ্রকে পথে এনে আজ "বিনোদিনী আমাকে এতো চেষ্টায় দুর্লভ ফলের মতো এত উচচশাখা হইতে পাড়িয়া লইল, তাহার পরে ঘ্রাণমাত্র না করিয়া আজ মাটিতে ফেলিয়া দিতেছে কেন?" (র-র ৩, পৃ. ৪৮৩)। সহ্যশক্তি অতিক্রান্ত হলে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে মরতে নির্দেশ দিল। বিনোদিনী জবাব দিল, "…কিন্তু যতদিন বিহারীর আশা আছে, ততদিন আমি মরিতে পারিবনা।" (র-র ৩, পৃ. ৪৮৯)।

ধীরে ধীরে মহেন্দ্র আত্মোপলব্ধি করল "আমি সর্বাংশেই বিনোদিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবু আজ আমি সর্বপ্রকার হীনতা ও লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়া ঘৃণিত ভিক্ষুকের মতো তাহার পশ্চাতে অহোরাত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছি, এমনতরো অদ্ভুত পাগলামী কোন্ শয়তান আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।" (র-র ৩, পৃ. ৪৯১)।

এই সময়ে নাটকীয়ভাবে বিহারীর আবির্ভাব। বিনোদিনীর আত্মকাহিনীর বর্ণনায় বিহারী তৃপ্ত হল, বিহারীর পায়ের ধুলা মাথায় নিয়ে আবার সে নিজের সতীত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হল। শেষ পর্যন্ত অভিভূত বিহারী তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। বিনোদিনী

বললো, "ছি ছি, এ কথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারেনা। ছি, ছি, একথা তুমি মনে আনিয়ো না।" (র-র ৩, পৃ. ৪৯৭)।

পরবর্তীকালে সাবিত্রীর মুখে একই সংলাপ উচ্চারিত হয়েছিল, কিন্তু সাবিত্রী সমাজে পতিতা, বিনোদিনী তো তা নয়। যাকে এতো কিছুর পর রাজলক্ষ্মী পর্যন্ত ক্ষমা করলেন তার এই হীনমন্যতা কেন? এখানে রবীন্দ্রনাথ পরাজিত এবং কিয়ৎপরিমাণে লজ্জিত। শেষপর্যন্ত বিনোদিনী উপন্যাসের নায়িকা হয়েই রইল, সংসারে ঠাঁই পেলনা। "বিনোদিনী হাত জোড় করিয়া কহিল, 'ভুল করিয়ো না—আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবেনা, তোমার গৌরব যাইবে—আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাকো—আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।" (র-র ৩, পৃ. ৪৯৮)।

শান্ত, সুবোধ বালকের ন্যায় বিহারী বিনোদিনীর নির্দেশ মেনে নিল। এতো সযত্ন প্রয়াসে আধুনিক উপন্যাসের নায়িকার যে আঁতের কথা রবীন্দ্রনাথ টেনে বের করতে চেয়েছিলেন তাকে সারা ভারত অবাঞ্ছিত পুরুষের সঙ্গে ঘুরিয়ে এনে বিহারীর সঙ্গে স্বর্ণমূর্তিতে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন। অবশ্য ঔপন্যাসিক জানেন এর অন্য সুষ্ঠু সমাধান ছিল কিনা, তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন সমাজের মুখ চেয়ে তাঁকে এমন পরিসমাপ্তি টানতে হয়েছে।

ওদিকে মহেন্দ্র দু'বার ধুতির কোচার ধুলো ঝেড়ে আশাকে আবার বুকের ভেতর পেল। জড়ভোগ্য বস্তুবৎ আশা পতিপরম গুরুকে পেয়ে ধন্য হলো। অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রকে বললেন, "ছেলে ধূলা লইয়াও মার কোলে আসিয়া বসে।" (র-র ৩, পৃ. ৫০৭)।

শেষ পর্যন্ত বিনোদিনী বিহারী প্রদত্ত আঘাতের ক্ষতচিহ্ন, তার শ্রেষ্ঠ অলংকার ও অহংকার "তুমি জাননা—এ তোমারই আঘাত—এবং এ আঘাত তোমারই উপযুক্ত। ইহা এখন তুমিও ফিরাইতে পারনা" বালিকা পার্বতীর মুখে পরবর্তীকালে এই সংলাপ সহনশীল হলেও বিনোদিনীর মুখে যেন মঞ্চ নায়িকার সংলাপে পরিণত হয়েছে।

রোহিণী তার পূর্ণ যৌবনে প্রণায়স্পদের হাতে মৃত্যু বরণ করে, এদিক থেকে তার পরিণামে দুঃখ থাকলেও অপমান বা অবমাননার লজ্জা নেই, কিন্তু দ্বারে দ্বারে ভিখারিণী বিনোদিনীর জন্য লজ্জাবোধ করি। অবশ্য ঔপন্যাসিক নিজেই পরবর্তী কালে এ-উপন্যাসের পরিসমাপ্তি সম্পর্কে তাঁর স্বইচ্ছার চেয়ে সমাজের দাবীকেই বড় বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন এমন মন্তব্য পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে কি স্রষ্টার সৃষ্টির মালিন্য ঘুচে যায়? বিনোদিনী আর্তের সেবায় নিয়োজিত হলো, বিহারী ব্রহ্মচর্য পালনে ব্রতী হলো। কিন্তু কেন? বিনোদিনীকে ভালবেসে না আশাকে পুনর্বাসিত করবার পরম তৃপ্তিতে এমন হাজারো প্রশ্ন পাঠকদের সামনে এসে তার চিন্তার জগৎকে আলোড়িত করে। বিনোদিনীর পরিণাম এর চেয়ে উন্নততর কি হতে পারতো আমি জানিনা তবে সে সম্পর্কে লেখকের দোলায়মানচিত্ততা আমি উপলব্ধি করি। বিনোদিনী রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মানসের এক সুন্দর, গ্রন্থিবহুল, উপভোগ্য জটিল চরিত্র, যার উপস্থাপনা আছে কিন্তু পরিণাম নেই। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসে কেন জানিনা নারীচরিত্র অঙ্কনে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতায় শক্তিসাধক বঙ্কিমকে অনেক ঊর্ধ্বে স্থাপনের বাসনা জাগে। কারণ আশা এবং বিনোদিনী দুইই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারাচ্ছন্ন দুটি ব্রততী। আশা স্বামী রূপ বৃক্ষের আশ্রিতা আর বিধবা বিনোদিনী দুর্বল বৃক্ষ পরিত্যাগ করে মহীরুহকে

অবলম্বন করে তৃপ্ত। আমার চোখে এই মাত্র ব্যবধান। মহৎশিল্পী রবীন্দ্রনাথ এখানে মহত্তর শিল্প সৃষ্টি করেছেন কিন্তু নারীর পৃথক সত্তার ওপর তার আস্থা স্থাপন করতে পারেননি বলেই মনে হয়।

'চরিত্রহীন' উপন্যাস ১৩২০ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে চৈত্র ও ১৩২১ বঙ্গাব্দে 'যমুনা' পত্রিকায় আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১১ই নভেম্বর, ১৯১৭ অর্থাৎ কার্তিক ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। 'চোখের বালি'র সঙ্গে প্রকাশের ব্যবধান ১৫ বছরের, প্রায় দেড় যুগ। তবুও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সঙ্গে 'চোখের বালি'র প্রকাশ কালের ব্যবধানের মাপকাঠিতে অর্ধেক সময়। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস প্রকাশের জন্য যমুনা সম্পাদককে অনেক সমালোচনা, ভর্ৎসনা ও ভীতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র তখন দেশের বাইরে অর্থাৎ রেঙ্গুনে। সম্ভবতঃ স্বসমাজের বাইরে বহুজাতি মিশ্রিত সমাজে একটি মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবেশে বসে এই উপন্যাস রচনা তার পক্ষে সহজতর হয়েছিল। বাংলার সমাজের প্রতিদিনকার সামাজিক সংস্কারকে তিনি সতীশের কোষাকুষি আর সাবিত্রীর একাদশী দিয়ে চাপা দিতে চেয়েছিলেন।

বঙ্কিমমানস কন্যা রোহিণী, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র নায়িকা বিনোদিনীর সঙ্গে কালানুক্রমিক ধারায় নারীর অহং-সত্তার চেতনায় আমি 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ীকে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। রোহিণী ও বিনোদিনী উভয়ই বিধবা; তাদের হৃদয় সিংহাসনশূন্য ছিল তাই অন্যকে আহ্বান জানাবার আকাঙক্ষা যেমন ছিল, আত্মিকদ্বন্দ্বেরও অবকাশ ছিল না। কিন্তু কিরণময়ীকে প্রথম দর্শনেই আমরা দেখেছি সে সধবা। অবশ্য সমালোচনার ধারায় রোহিণী ও বিনোদিনীর সঙ্গে সাবিত্রীর সংযোজিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই চরিত্রের ভেতর শরৎচন্দ্রের রোমাণ্টিক মনে এতো বাষ্প ও কুয়াশাচ্ছন্নতা এসেছে যে তাকে কাল্পনিক বলেই মনে করা যায়। তার দুঃখ আছে, বেদনা আছে, প্রেমের জন্য আত্মোৎসর্গের মহিমা আছে কিন্তু নারীত্বের গৌরব নেই। কিরণময়ী সে ধনে ধনী। আশ্চর্য! সেকালের সমাজপতিরা এমনকি বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত সাবিত্রীকে নিয়ে টানাটানি করেছেন কিন্তু কিরণময়ীর কথা ভাবেননি। হয়তো বা তার পরি-ণামের পাগলামী তাকে অন্যের অভিশপ্ত দৃষ্টি থেকে দূরে রেখেছে। কিরণময়ী শরৎ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্র এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। শরৎসাহিত্যে উচচশিক্ষিতা নারীর স্থান নেই। কিরণময়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী আনতে যায়নি সত্য কিন্তু তার পরিবারের জগৎ ও জীবনসম্পর্কিত সবটুকু জ্ঞানের সে অধিকারিণী। তার জীবন-দর্শন গভীর জ্ঞানসঞ্জাত, 'শেষ প্রশ্নে'র কমলের মত সে বিলাতী তর্কের বাণ্ডিল নয়। মানুষ হিসাবে বাস্তবজীবনের রূপরসগন্ধের উপভোগের অধিকার যদি তার থাকে তা হলে কিরণময়ী একটি জ্বলন্ত অগ্নি শিখাবৎ দেদীপ্যমান সত্য। কালের ঠিকানা তার কাছে অবহেলিত। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্রও এ চরিত্রের রূপবর্ণনা করেননি কিন্তু প্রসঙ্গ ক্রমে যা এসেছে তাও উপেক্ষণীয় নয়।

উপেন্দ্র যখন সতীশকে নিয়ে পাথুরে ঘাটার হারাণদার বাড়িতে প্রবেশ করে তখন সতীশ বলেছিল "ভাল করে না জেনে ঢোকা যায় না, এটা পাতাল-প্রবেশের সুড়ঙ্গও হতে পারে।" (চরিত্রহীন, শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, একাদশ সম্ভার, পৃ. ৮৩)। বক্তব্যটি আমাদের কাছে নিঃসন্দেহে ইঙ্গিতবাহী, অন্ততঃ উপেন্দ্রের জন্য। তারপর সেই নড়বড়ে ভাঙাবাড়ি সদর দরজা খোলা হলে দু বন্ধু দেখলেন "মাথার উপরে অল্প একটুখানি আঁচলের ফাঁক দিয়া সযত্ন-রচিত কবরীর এক অংশ দেখা যাইতেছে। দেখা গেল, তাহার একটি মাত্র কেশও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। নিখুঁত সুন্দর মুখের উপর হাতের আলোকসম্পাতে ভ্রূযুগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কাঁচপোকার টিপ চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল এবং ঈষৎ আনত

চোখ দুটি দিয়া যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল, চতুর্দ্দিকের নিবিড় অন্ধকারে তাহার অপূর্ব্ব জ্যোতি ক্ষণকালের জন্য উভয়কেই বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিল। সতীশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা বাধা পাইয়া বারংবার ফিরিয়া যাইতেছে। সে উপেন্দ্রের গা ঠেলিয়া দিল।" (শ-সা-সং ১১, পৃ. ৮৪-৮৫)। নারী সঙ্গে কিছুটা অভ্যস্ত সতীশ এ রমণীর রূপ চিনলো, পত্নীগতপ্রাণা উপেন্দ্রের গায়ে ঠেলা দেবার প্রয়োজন তাই সে অনুভব করেছিল। কিরণময়ীর চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট কুইঙ্গিত সতীশ তার বন্ধুকে দিতে ইতস্ততঃ করলো না।

হারাণ উইল করে সবসম্পত্তি বন্ধুকে দিয়ে গেল, সঙ্গে জননী অঘোরময়ীর দায়িত্ব। স্ত্রীর নামও উচচারণ করলো না। সুতরাং "উপেন্দ্র সতীশ চলিয়া গেলে কপাট রুদ্ধ করিয়া সেইখানেই কিরণময়ী দাঁড়াইয়া রহিল। অন্ধকারে তাহার চোখ দুটো হিংস্র জন্তুর মতই জ্বলিতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া কাহারো বক্ষঃস্থলে দংশন করিতে পারিলে সে বাঁচে। হাতের দীপটা উঁচু করিয়া ধরিয়া উন্মাদ ভঙ্গী করিয়া বলিল, আগুন ধরিয়ে দেবার উপায় থাকলে দিতুম। দিয়ে যেখানে হোক চলে যেতুম (শ-সা-সং ১১, পৃ. ১০০)।" আজন্ম ভোগ থেকে বঞ্চিতা, কঠোরতমভাবে লাঞ্ছিতা, দারিদ্র্য-পীড়িতা এক ঐশ্বর্যশালিনী রূপবতী তার শেষ আশ্রয়টুকু হারাতে বসেছে। তার এই অন্তরলোকের সংবাদ পরিবেশন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সত্যিই 'আঁতের কথা' তুলে ধরায় শিল্পী শরৎচন্দ্র এখানে সার্থক।

পরদিন দিনের আলোয় সতীশ এ রমণীকে দেখল, "···আজ দিনের বেলা, সূর্য্যালোকে স্পষ্ট বোঝা গেল, এমন সৌন্দর্য্য আর কোনোদিন চোখে পড়ে নাই। জীবতও না, ছবিতেও না।" (শ-সা-সং ১১, পৃ. ১০৪)।

এরপর সতীশের কাছে কিরণময়ী উপেন্দ্রের দাম্পত্য জীবনের কাহিনী শুনলো। তৃষার্ত চাতকের মত সে অমৃতের স্বাদ গ্রহণের জন্য কিরণময়ী অসাধ্যসাধনায় ব্রতী হলো। এই অনুভূতি "···কিরণময়ীর চোখে তাহার স্বামীর শুষ্ক দেহটাকেও আজ মহামূল্য করিয়া দিল। এই অর্দ্ধমৃত দেহটার লোভেই অকস্মাৎ সে ভয়ানক লুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার আচার-আচরণের এই আকস্মিক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন মৃত্যুর উপকূলে দাঁড়াইয়া হারাণও লক্ষ্য করিলেন।" (শ-সা-সং ১১, পৃ. ১১৪)। কারণ হারাণ কিরণময়ীকে ছাত্রীজ্ঞানে দর্শন দিয়েছেন, শাশুড়ী দিয়েছেন জ্বলন্ত কাঠ খণ্ডে সেঁকা। এই নূতনরূপে অঘোরময়ী পর্যন্ত কিঞ্চিত বিস্মিত বোধ করলেন "অঘোরময়ী দ্বারের সম্মুখে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজ যে বস্তুটি তাহার চোখে পড়িল, তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ তাঁহার ছিলনা। যে স্তব্ধ মুখের উপরে উনানের রক্তাভ আলোক বিচিত্র তরঙ্গের মত খেলিয়া ফিরিতেছিল, সেই মুখ তাহার সমস্ত অভিজ্ঞতার বাহিরে। এ মুখে খুঁৎ আছে কিনা সে আলোচনা চলেনা। নিখুঁৎ বলিয়াও ইহাকে প্রকাশ করা যায়না! ইহা আশ্চর্য্য! ইহাকে পূর্ব্বে দেখেন নাই—ইহা অপূর্ব্ব! নির্ণিমেষ চোখে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ মুখ দিয়া তাহার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। (শ-সা-সং ১১, পৃ. ১২০)।" এখানে অঘোরময়ী চরিত্রের সঙ্গে 'চোখের বালি'র রাজলক্ষ্মীর সাদৃশ্য মেলে। রাজলক্ষ্মী জা অন্নপূর্ণার প্রতি ঈর্ষাবশতঃ বিনোদিনীকে নিজপুত্রের দিকে ঠেলে দিয়েছেন আর অঘোরময়ী ভবিষ্যৎ গ্রাসাচ্ছদনের আশংকায় বধূকে উপেনের দৃষ্টিগোচর করতে চেয়েছেন। তবুও অঘোরময়ী ক্ষমার যোগ্য কারণ অন্নচিন্তার জন্য মানুষ সবই করতে পারে।

কিরণময়ীর রূপের কথা সবার মুখ থেকে শুনেছি। সুরবালা সুন্দরী শুনে কিরণময়ী জানতে চেয়েছেন সে কি তার চেয়েও সুন্দরী? সতীশ উত্তরে বলেছে, "আমার মতা-মতের বেশী দাম নেই। কিন্তু যদি থাকে, তাহলে এই বলি আমি, আপনার মত রূপ

বোধকরি পৃথিবীতে আর নেই (শ-সা-সং ১১, পৃ. ১২৪)।" উপেন্দ্র সুরবালার আলোচনায় সতীশের কাছ থেকে সে সবই জানলো। শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেমে উপেন্দ্রের প্রতি তার হৃদয় মুহূর্তে সমর্পিত হলো। সতীশ তাকে কোনরূপে গ্রহণ করলো। ক্রমশ হারাণের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে বাড়ি ক্রোকের পরওয়ানা এলো, কিরণময়ী দিশেহারা বোধ করলো। ভবিষ্যৎ তো মসীলিপ্ত, সতীশ সান্ত্বনা দিল, চিন্তার কোন কারণ নেই। উপেন্দ্র তাদের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু যে উত্তর আমরা পেলাম তা আজকের দিনেও পৃথিবীর এই অংশের মেয়েরা দিতে পারে কিনা সন্দেহ। পথ ছাড়া যার আর কোন আশ্রয় নেই সে অনায়াসে বললো, "বুঝেচি, অনাথাকে তিনি জানেন, কিন্তু শুধু দেওয়াইত নয়, নেওয়াওতো আছে। দিয়ে কখনও দেখিনি ঠাকুর পো, কিন্তু সারাজীবন পরের মন যুগিয়ে নিতে পারা যে কম কঠিন নয় সে-কথা যে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েচি।" (শ-সা-সং ১১, পৃ. ১৩৯) বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জন মেয়ের মত কিরণময়ী সতীশকে বলেছে, "এ তে আবার কিন্তু আছে কোন্‌খানটায়? ঠাকুর পো, আমি যে মেয়েমানুষ? মেয়েমানুষের কি কখনও অসুখ হয়, না, মেয়েমানুষ মরে? কোথায় শুনেচ, অযত্নে অত্যাচারে মেয়েমানুষ মরে গেছে?" (শ-সা-সং ১১, পৃ. ১৪৩) আজ অর্ধশতাব্দী পরেও বাংলার মেয়েরা এই একই কথা বলে চলেছে।

হারাণের মৃত্যুর পর উপেন্দ্রকে কিরণময়ীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে হল। "নারীর সম্বন্ধে উপেন্দ্রর মত পরিবর্তন করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতে হইল, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের মধ্যে মস্ত ভুল ছিল। এমন নারীও আছে যাহার সম্মুখে পুরুষের অভ্রভেদী শির আপনি ঝুঁকিয়া পড়ে। জোর খাটে না, মাথা অবনত করিতে হয়। এমনি নারী কিরণময়ী (শ-সা-সং ১১, পৃ. ১৬৭)।" কিরণময়ী অকপটে তার জীবনবৃত্তান্ত উপেন্দ্রের কাছে ব্যক্ত করলো। তাঁর স্বামী নামক গুরু ও শাসকের প্রেমহীন সম্পর্ক, শাশুড়ীর অত্যাচার, অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে প্রেম কিছুই গোপন করলোনা। মহাভারতের জবালার মতো তার সমস্ত দুঃখ বেদনা কলঙ্ক উপেন্দ্রের পাদপদ্মে প্রেমের সঙ্গে উৎসর্গ করল। উপেন্দ্র কিরণময়ীকে শ্রদ্ধা করলো এবং তারই হাতে মাতৃক্রোড়ে শিশুর মত দিবাকরকে অর্পণ করে তার কর্মস্থলে ফিরে গেল।

অঘোরময়ী কাশী যেতে চাইলেন। কিরণময়ী সানন্দে মত দিল কারণ তাদের গৃহ "এই যে কি অন্ধকূপ সে শুধু আমরাই জানি। যান যান দিন-কতক এই দুঃখের গণ্ডী থেকে অব্যাহতি পেয়ে বাঁচুন।" (শ-সা-সং ১১, পৃ. ১৭৭)।

শুরু হল দিবাকর কিরণময়ীর শাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চা। মুগ্ধ যুবক দিবাকর কিরণময়ীর পাণ্ডিত্যে শ্রদ্ধানত হলো, রূপের ঐশ্বর্যে হলো মুগ্ধ কিন্তু সেখানে কোনও পাপস্পর্শ ছিলনা। কিরণময়ীর মুখ থেকে ধর্ম সম্পর্কিত অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের ও তত্ত্বের ধারণা তার রূপকার তুলে ধরেছেন। ধর্ম যে ভালবাসার ধন তা আমাদের কেউ শিক্ষা দেয়না। আমাদের কাছে ধর্ম বলতে "খেতে, শুতে, বসতে ভগবানের দোহাই, আর ধর্মের দাঁত-খিচুনি! কেন বাপু? কেন এমন করে হাঁচব, আর তেমন করে কাসব? অথচ, এত তেজ যে, কোথাও এতটুকু কারণ পর্য্যন্ত দেখাবার দরকার কেউ মনে করেননি। শুধু জবরদস্তি। তোমার গো-হত্যার, ব্রহ্ম-হত্যার পাতক হবে, তুমি উচ্ছন্ন যাবে, তোমার চৌদ্দ-পুরুষ নরকে যাবে। কেন যাবে? কে তোমাকে বলচে? শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ, সমস্তই এ গায়ের জোর আর চোখ-রাঙানি। বাস্তবিক, এত অন্যায় জোর সহ্য হয়না ঠাকুরপো। (শ-সা-সং ১১, পৃ. ১৮৪-৮৫)।" উপেন্দ্র কথা বললোনা কিন্তু দিবাকর প্রতিবাদ করল।

উপেন্দ্রের শুধু প্রথম রাত্রির কথা মনে পড়ল "এ সেই মূর্ত্তি! পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য-পশুর সেই মর্ম্মান্তিক গর্জ্জন। কিন্তু, কি চায় এ? কিসের বিরুদ্ধে ইহার এত আক্রোশ? শাস্ত্র

এবং শাস্ত্রকারের কোন্ অনুশাসনের শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া এই বিধবা মুক্তি প্রার্থনা করে? (শ-সা-সং ১১,পৃ. ১৮৫)" তার পর অন্তরভরা ঈর্ষা নিয়ে সে জোর করে সুরবালার সঙ্গে দেখা করতে গেল। সুরবালার বদ্ধমূল দৃঢ়ভিত্তিক ধর্মবিশ্বাসে সে অভিভূত হলো। সুরবালা আমাদের ভ্রমর নয়, আমাকে বার বার মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু নৈয়ায়িক কিরণময়ী উপলব্ধি করল 'বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহু দূর'। সে নিঃশেষে নীরবে উপেন্দ্রকে তার হৃদয় উৎসর্গ করে শান্তিতে জীবন কাটাতে চাইল, অকপটে আত্মসমর্পণ করলো। উপেন্দ্রকে সামনে বসিয়ে কিরণময়ী বলেছে: "তোমাকে বলেচি ত ঠাকুরপো, স্বামীকে আমি ভালবাসিনি, ভালবাসা পাইনি। সেজন্যে আমাদের খেদ ছিল না। বাড়ীর মধ্যে স্বামী আর শাশুড়ী। একজন দার্শনিক,—তিনি আমাকে প্রাণপণে পড়িয়েই খুশি, আর একজন ঘোর স্বার্থপর—তিনি প্রাণপণে আমাকে খাটিয়ে নিয়েই খুশি ছিলেন। এমনি করেই দিন কেটেছিল, এবং কেটেও যেত বোধ করি, কিন্তু হঠাৎ একসময় সব উল্টে-পাল্টে গেল। স্বামী অসুখে পড়লেন। তাঁর কাছে আমি বই পড়েচি অনেক। নাটক নভেলও কম পড়িনি, কিন্তু দুজনেই পড়ে পড়ে শুধু হাসতুম। ভালবাসার নামগন্ধও আমাদের বাড়ীতে ছিল না, তাই এক একজন লোক যেমন থাকে জন্ম-বধির, জন্মান্ধ, আমার স্বামীও ছিলেন তেমনি জন্ম-নীরস। কিন্তু আমার মধ্যে যে কত রস ছিল তা কখনও জানতে পারিনি বটে, কিন্তু এটা একদিন হঠাৎ টের পেয়ে গেলুম যে, ভালবাসার এবং তা ফিরিয়ে পাবার তৃষ্ণাটা আমারও কোন মেয়ের চেয়েই কম নয় (শা-সা-সং ২০১, পৃ. ২০২)।" তারপর অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে প্রেমের অভিব্যক্তির বর্ণনা "কি জানো ঠাকুরপো, যে তৃষ্ণায় মানুষ নর্দ্দমার গাঢ় কালো জলও অঞ্জলি ভরে মুখে তুলে দেয়, আমারও ছিল সেই পিপাসা। কিন্তু সে-খবর পেলুম সেই জল গলায় ঢেলে দিয়ে। তারপরে—উঃ সে কি গা-বমি-বমি দিনগুলোই কেটেচে; বলিতে বলিতেই তাহার আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিল। একটা উৎকট দুর্গন্ধময় বিষাক্ত উদগার যেন তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কিরণময়ী পুনশ্চ কহিল, কিন্তু বমি করতেও পারলুম না ঠাকুরপো, শাশুড়ী আমার মুখ চেপে ধরলেন। অনঙ্গ তখন সংসারের অর্দ্ধেক ভার নিয়েছিল। (শ-সা-সং ১১, পৃ. ২০২-২০৩)।"

ভালবাসা নিবেদন করে নিঃশঙ্কচিত্তে সে উপেন্দ্রকে বললো, "আমি জানি তোমার সুরবালা আছে। আর আছে তোমার নিষ্ঠুর কঠিন পবিত্রতা। সে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, বজ্রের মত শক্ত। তার গায়ে দাগ দিতে পারি, সে আমার সাধ্য নয়। কিন্তু জানত ঠাকুরপো, মানুষের এমনি পোড়া স্বভাব, যা তার সাধ্যাতীত, তাতেই তার সবচেয়ে লোভ। ভগবানকে পাওয়া যায়না বলেই মানুষ এমন করে সব দিয়ে তাকে চায়। (শ-সা-সং ১১, পৃ. ২০৫)।"

উপেন্দ্র দেখেছে কিরণময়ীর স্বামীর সেবা, সতীশ প্রত্যক্ষ করেছে, দুজনেই এর ভিতর বিন্দুমাত্র সততা ও নিষ্ঠার অভাব আছে বলে মনে করেনি।

কিরণময়ী চরিত্রের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তার আত্মদম্ভ, এদিক থেকে সে বিনোদিনীর স্বগোত্র। তাই মিথ্যা অপবাদ মাথা পেতে নিতে না পেরে যখন উপেনের মুখের ওপর বলে বসল "নিজের বেলা বুঝি কুলটার হাতের মিষ্টান্নে ভালবাসার মধু বেশি মিঠে লাগে ঠাকুরপো? (শ-সা-সং ১১, পৃ. ২৪৯)।" শেষপর্যন্ত পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে গিয়ে বিনোদিনী আহত হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণা হয়ে উঠেছে। কিরণময়ীও ঠিক তাই। উপেন্দ্র তাকে বলেছে, "নাস্তিক, অপবিত্র ভাইপার।" কিরণময়ীও মিথ্যা কলঙ্ক মাথা পেতে নিলেন। উপেন্দ্রকে জব্দ করার জন্য তার স্নেহের ধন দিবাকরের হাত ধরে ক্রোধে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আরাকানে পাড়ি দিল, বিনোদিনীও অনুগত ভক্ত

মহেন্দ্রকে নিয়ে পশ্চিম পরিভ্রমণে গেল। ব্যবধান যে কারণেই হোক মহেন্দ্রকে বিনোদিনী আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু কিরণময়ীকে দিবাকর বুঝতে পারেনি। তাই শরৎচন্দ্র এই গৃহত্যাগ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "কাঁচপোকা যেমন করিয়া পতঙ্গকে টানিয়া আনে, তেমনি করিয়া দুর্নিবার যাদু-মন্ত্রে কিরণময়ী অর্দ্ধ-সচেতন, বিমূঢ়-চিত্ত হতভাগ্য দিবাকরকে জাহাজ-ঘাটে টানিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল এবং টিকিট করিয়া আরাকান যাত্রী-জাহাজে চড়িয়া বসিল।" (শ-সা-সং ১১, পৃ. ২৫২) 'চোখের বালি'তে মহেন্দ্রের উদ্যোগ আর এখানে কিরণময়ী চালিকাশক্তি, কারণ শুধুমাত্র উপেন্দ্রের মাথা হেঁট করা।

এর পর সমগ্র উপন্যাস জুড়ে আছে সতীশ, সরোজিনী, জ্যোতিষ, শশাঙ্ক, বেহারী, সুরবালার ব্যাধি, মৃত্যু এবং উপেন্দ্রের রাজরোগ। সাবিত্রী এসেছে সতীশের বাড়ীতে তাঁর গুরু তাড়াতে, রোগের সেবা করতে, সরোজিনী এসেছে প্রণয়াস্পদকে দেখতে এবং পরবর্তীকালে সাবিত্রীর সামনে সতীশ ও সরোজিনীর বিয়ের প্রস্তাব উপেন্দ্র শুধু পাকা করলেন না, তাদের হাতে হাত দিয়ে বিয়ের ও সরোজিনীকে সযত্নে রাখবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন। আর সাবিত্রী? উপেন্দ্র বললেন "তুই ভাল হ, আশীর্ব্বাদ করি তোরা সুখী হ—আমি আমার এ বোনটিকে নিয়ে চলে যাব ···আমার ভার নেবার আর কেউ নেই দিদি। আর-যে অসুখ, তাতে আর কাউকে কাছে ডাকতে সাহস হয় না, হওয়া উচিতও নয়। শুধু তোমার মত যার পরের জন্যেই কেবল বেঁচে থাকা, আমার সেই বোনটির ওপরে নিজেকে সঁপে দিতে পারি। যাবে দিদি আমার সঙ্গে? সতীশকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে,—তা হলোই বা। এর চেয়ে কত বেশী দুঃখ-কষ্ট যে ভগবান মানুষকে সইতে দিয়ে মানুষ করে তোলেন ভাই!" (শ-সা-সং ১১, পৃ. ৩৩৯) প্রগতিশীল বিপ্লবী শরৎচন্দ্র কত সহজে সাবিত্রীর জীবন, প্রেম ভবিষ্যৎ সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন। বিনোদিনী বিহারীকে তবুও যা হউক প্লেটনিক লাভের ভেতর দিয়ে গোঁজামিল দিয়ে বেঁচে রইল রবীন্দ্রনাথের হাতে। কিন্তু পাপিষ্ঠা সাবিত্রীর জন্য সে আশ্রয়টুকুও রইলনা, আড়ালে সতীশ কিছুটা আস্ফালন করল। কিন্তু সব বৃথা, বিনোদিনীর মত সেই একই সংলাপ—"আমি বিধবা, আমি কুলত্যাগিনী, আমি সমাজে লাঞ্ছিতা, আমাকে বিয়ে করার দুঃখ যে কত বড়, সে তুমি বোঝনি বটে, কিন্তু যিনি আজন্ম শুদ্ধ, শোকের আগুন যাঁকে পুড়িয়ে হীরের মত নির্মল করেচে, তিনি বুঝেচেন বলেই এই হতভাগিনীকে আশ্রয় দিতে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চেন। তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা আজ তুমি ঝোঁকের উপর দেখতে পাবে না, কিন্তু তাই বলে তাঁকে মিথ্যা দোষারোপ করে অপরাধী হয়ে থেকো না। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। (শ-সা-সং ১১, পৃ. ৩৪৪)।" সত্যইতো এ কলঙ্কিতা রমণীর যা হোক একটা আশ্রয় যে মিললো তাতেই তো উপেন্দ্রকে মহানুভব বলা যায়। কিন্তু বিধবা কিরণময়ী যে দিন সুরবালার স্বামীর কাছে প্রেম নিবেদন করেছিল সে দিন তো কোন নীতি বাক্য আমরা শুনতে পাইনি। শরৎচন্দ্র নারীর অন্তরের দ্বার খুলে দিয়েছেন এ কথা সত্য কিন্তু সমাজের বেড়া ডিঙাতে দেননি।

শেষপর্যন্ত সতীশ কিরণময়ী ও দিবাকরকে নিয়ে এলো কলকাতায়। গঙ্গার ঘাটে সাবিত্রী কিরণময়ীকে উন্মাদিনী রূপে দেখলো, অবশ্য সেই যে কিরণময়ী তা জানতে পারেনি। পাগলী জনৈক বৃদ্ধকে প্রশ্ন করেছিল, "ঠাকুর, ভগবানকে আপনি বিশ্বাস করেন? তাঁকে ডাকলে তিনি আসেন? কি করে আপনারা তাঁকে ডাকেন? আমি পারিনে কেন? আমার বিশ্বাস হয় না কেন? (শ-সা-সং ১১, পৃ. ৩৬৮)।

উপেন্দ্রের মৃত্যুর সময় নাটকীয়ভাবে কিরণময়ী প্রবেশ করলো মা কালীর প্রসাদ নিয়ে। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বললো, "মরে যাই! সুরবালা আর নেই শুনে আমি কেঁদে বাঁচিনে।

সেই ত আমার গুরু! সেই ত আমাকে বলেছিল, ভগবান আছেন! তখন যদি তার কথাটা বিশ্বাস হতো! সহসা তাহার চক্ষু দিবাকরের পাণ্ডুর মুখের উপর পড়িতেই বলিয়া উঠিল, আহা! তুমি অমন কুণ্ঠিত হয়ে রয়েচ ঠাকুরপো, তোমাকে কি এরা লজ্জা দিচ্চে? বলিয়াই উপেন্দ্রর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, ওকে তোমরা দুঃখ দিয়োনা ঠাকুরপো, আমার হাতে যেমন ওকে সঁপে দিয়েছিলে, সে সত্য একদিনের জন্যে ভাঙিনি—ওকে প্রাণপণে রক্ষা করে এসেচি। কিন্তু আর আমার সময় নেই—এবার ওকে তুমি ফিরিয়ে নাও। (শ-সা-সং ১১, পৃ. ৩৭২)।" কিরণময়ী উন্মাদ, নাস্তিকের শাস্তি পেল কিন্তু আমরা তো তার ভেতর কোন উন্মাদ দশা লক্ষ্য করিনা। যে এ সমস্ত কথাগুলো উচ্চারণ করলো তাকে উন্মাদ বলবে কোন উন্মাদ? তবে হ্যাঁ অবিশ্বাসীকে ঈশ্বরভক্তি অন্ততঃ কালী-ভক্তি দান করে শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহে পূণ্য কাজ করেছেন।

মোটামুটি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই তিনজন যুগন্ধর ঔপন্যাসিকের আপাত দৃষ্টিতে সমধর্মী অর্থাৎ সমসমস্যা জর্জরিত তিনটি চরিত্রকে এ-প্রবন্ধে আমি উপস্থাপিত করেছি। উদ্দেশ্য সমকালীন চেতনার পরি প্রক্ষিতে এই তিন জন স্রষ্টার নারীর প্রেম, হৃদয়, অহংসত্তা ও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের তুলনামূলক মূল্যায়ন করা।

আমার ধারণা বঙ্কিম নিজস্ব সংস্কারের গণ্ডীতে ব্রাহ্মণত্বের অহংকারে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন একথা যেমন সত্য তেমনি নরনারীর প্রেম প্রীতি ভালবাসা ও তার সামাজিক অনুশাসনের রূপরেখাকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছেন। সত্যকে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা বা মানসিকতা তার নেই। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে রোহিণী পল্লীবালা অর্ধশিক্ষিতা আজন্ম প্রেমসঙ্গ বঞ্চিতা, সুতরাং হরলাল অথবা গোবিন্দলাল যে কোন একজনের ইঙ্গিতই তার দেহদানের জন্য যথেষ্ট। তার আগে এসেছে দেহের দাবী, পরে মন অর্থাৎ প্রণয় বা ভালবাসা। তাই শেষ পর্যন্ত সে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু তার স্রষ্টা তাকে বাঁচতে দিতে রাজী নন। বাংলার ঘরে রোহিণীর অভাব নেই, তাদের দুঃখ বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছেন, ভালবাসার তৃষ্ণাকে অস্বীকার করেননি কিন্তু তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এই তিন নায়িকার মধ্যে রোহিণীর দৈহিক মৃত্যু ঘটেছে কিন্তু আত্মার অপমৃত্যু ঘটেনি। গোবিন্দলালের আকর্ষণ শেষে তাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়নি। বঙ্কিম উপলব্ধি করেছেন সংসারে রোহিণীরা আছে, কিন্তু তাদের চিত্তসংযম আবশ্যক নইলে ভ্রমরেরা বাঁচে না। অনেকে মনে করেন নীতিবাগীশ বঙ্কিমের হাতে কুন্দ ও রোহিণী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে দাঁড়িয়ে প্রেমাস্পদের আকর্ষণের যেখানে শেষ, জীবনের যবনিকাপাতও সেখানেই ঘটেছে। অপমানের বোঝা হয়নি। এ দিক থেকে পরবর্তী দুই ঔপন্যাসিকের চেয়ে বঙ্কিম নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মাতৃভক্ত বঙ্কিম রমণীকে শক্তিজ্ঞানে পূজা করেছেন তাই পূজার ফুলকে দু'পায়ে মাড়াতে পারেননি। অপরের করুণার হাত থেকে তাদের অব্যাহতি দান করে গৌরবময় মৃত্যু দান করেছেন। রোহিণীর পরিণামের সবচেয়ে বড় সমালোচক শরৎচন্দ্র কিন্তু আমরা পরবর্তীতে দেখব এই নারী দরদীর হাতে অনুরূপ পরিবেশে রোহিণীদের কি পরিণাম হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ উদারচেতা উপরন্ত ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী বলে দৈনন্দিন কুসংস্কার থেকে অনেক খানি মুক্ত। তাঁর বিনোদিনী মেমের কাছে পড়া। সুতরাং তিনি এ চরিত্র গঠনে বর্তমান সমাজব্যবস্থার বাস্তব দিক অর্থাৎ ধনবণ্টনে বঞ্চনার দিকটি তুলে ধরেছেন। বিনোদিনীর সর্বনাশের মূলে আছে আশার সুখ, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের প্রতি তার লোভ। এ সবকিছুই তো তার হতে পারত কিন্তু কেন হলনা? হেতু ঐ নাবালিকা খেলার পুতুল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্বের গতি কামাসক্তি বা লিবিডো-ভারাক্রান্ত বিনোদিনী নয়; এ তার

ঐশ্বর্য ভোগের দাবী। তার রূপ আছে, গুণ আছে, যোগ্যতা আছে তবে সে কেন পরের অনুদাস হয়ে থাকবে? এ কারণে ধীরে ধীরে মহেন্দ্রের সান্নিধ্যে আসা, তাকে জয় করা পর্যন্ত আমাদের কাছে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে জানলো বিহারী আশার প্রতি দুর্বল সেই মুহূর্তে সে হিংস্র হয়ে উঠলো, সে নিজস্ব কামনার আধার পরিবর্তন করলো। দুর্বল মহেন্দ্রকে পরিত্যাগ করে বিহারীর উপাসনায় সে সাধিকা হয়ে উঠলো। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বে দক্ষ কারিগর রবীন্দ্রনাথ ঠিক বিনোদিনীর মাধ্যমে আমাদের কাছে কি তুলে ধরতে চেয়েছেন তা আমার সম্পূর্ণ বোধগম্য হলোনা। অর্থনৈতিক কারণ, দারিদ্র্যের নিপীড়ন, আশারপ্রতি ঈর্ষা, মহেন্দ্রকে আকর্ষণ—এ পর্যন্ত অঙ্ক মিলে গেল। কিন্তু পরবর্তী পরিবর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আপনাকে বাঁচাতে, একটি সুখী দম্পতি ও অভিজাত পরিবারের আভিজাত্য রক্ষার জন্য এ সমাধান খুঁজে বের করলেন। 'চোখের বালি'র সমাপ্তির অতি নাটকীয়—মেলোড্রামা, ফুলের গয়না পরে বাসর সাজিয়ে বিহারীর পরিত্যক্ত গৃহে তার ধ্যান করা কবির রোমাণ্টিক মনের প্রতিফলন। এখানে স্রষ্টা কবি, মনস্তত্ত্ববিদ ঔপন্যাসিক নন। উপন্যাসের শেষ অংশ জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে এবং বিনোদিনীর অপমানে ক্ষুব্ধ হয়েছি। যে যার জায়গায় পুনর্বাসিত হলো শুধু পথের ধুলায় পড়ে রইল বিনোদিনী, বাকী জীবন গ্রাসাচ্ছদনের নিশ্চয়তা বিহারীর কাছ থেকে পাওয়াই কি বিনোদিনীর সব পাওয়া সব চাওয়ার পরম সমাধান হল? রোহিণীর ত্রিশ বছর পর সমাজের মঞ্চে বিনোদিনী এসেছে রবীন্দ্রনাথের মত আন্তর্জাতিক মানসিক উদারতাসম্পন্ন স্রষ্টার হাত ধরে। তা হলে তার জন্য এ কৃচ্ছ্র সাধন, আশ্রম বাস কেন? আর জন্ম ভিখারী বিহারীরই বা কি হল? এ প্লেটোনিক মহব্বৎ কি এ যুগে চলে? এ দুজনের মিলনে তো বাঁধা ছিল না, কারণ তখনকার সমাজে যদি কুলত্যাগিনী মহেন্দ্রের মা, কাকীর ক্ষমা পেতে পারে তা হলে বিহারীর স্ত্রীর মর্যাদা পেতে অসুবিধা কোথায়? সাবিত্রী তার দেহের অপবিত্রতার কথা স্বীকার করেছে কারণ সে তার ঐ দেহ দিয়ে অনেককে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু বিনোদিনী বিহারীগত প্রাণা। বিহারীও আশাকে জব্দ করবার জন্য মহেন্দ্রকে নিয়ে একটু কৌতুক করে এল মাত্র। অন্ততঃ উপন্যাসের অতি লঘু পরিসমাপ্তিতে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের মান রেখেছেন। দুটি পবিত্র আত্মাকে পবিত্রতর হবার সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু নিজের অন্তরকে তিনি চোখ ঠেরেছেন তাই কাহিনীর এই পরিণতি, বিনোদিনীর এই পরিণাম তাঁর ইচ্ছা প্রসূত নয়। বিবাহ নারীজীবনে সব নয় জানি, কিন্তু মাতৃত্বতো তার পূর্ণতা আনে সে পূর্ণতা বিনোদিনী কেন পেলনা? বিনোদিনী সম্পর্কে তাই আমরা তেমনভাবে বেদনা বোধ করিনা। রোহিণীর মৃত্যু আমাদের বাজে, কিন্তু বিনোদিনীর আশ্রমবাস কেমন যেন ন্যাকামি মনে হয়। নারী প্রগতিতে আস্থাশীল রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে চণ্ডালিনী করেই রাখলেন; গৃহে প্রবেশের অধিকার দিলেন না।

এ দিক থেকে বঙ্কিম ঋজু, স্বচ্ছ, স্পষ্ট এবং পৌরুষসম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথ সমাজ ভয়ে বিব্রত, সঙ্কুচিত, দিশেহারা। তাই রোহিণীর দেহাবশেষের পর আর কিছু নেই কিন্তু বিনোদিনীর সব হারাবার পরও অনেক কিছুর আকুতি—শুধু শূন্যতার গ্লানি তার প্রাপ্য পুরস্কার। সুতরাং সময়ের ব্যবধান রবীন্দ্রনাথকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় থেকে অধিকতর উন্নত ও প্রগতিশীল মানসিকতার অধিকার দিতে পারেনি। আজ বিনোদিনীর করুণা ভিক্ষা, বার বার মহেন্দ্র ও বিহারীর পায়ে ধরা আমাদের ক্ষুব্ধ, চঞ্চল ও অপমানিত করে তোলে। এখানে নীতিবিদ বলে অভিহিত বঙ্কিম বিজয়ী।

কিরণময়ী শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের সবটুকু মমতা পেয়ে একটি নিটোল মুক্ত বিন্দুর মত আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিরণময়ী, রোহিণী ও বিনোদিনী উভয়ের সমস্যার জটিল মিশ্রিত রূপ, সম্ভোগস্পৃহা ও ধনলিপ্সা, বিলাস-আকাঙ্ক্ষা আর পাঁচজনের

মতো তারও ছিল। তার জীবনে প্রকৃতির নিয়মে কখন বসন্ত এসেছে তা সে ঐ অন্ধকূপে জানতেও পারেনি। কিন্তু যে বিধাতা তাকে গড়েছেন তাঁর তো কিছুই অজ্ঞাত ছিলনা। তাই রুগ্ন স্বামীকে ফেলে অনঙ্গর সান্নিধ্য পেতে ব্যাকুল হয়েছে এবং সেও শুধু দেহদানের জন্য নয় সংসারের অন্নসংস্থানের জন্যও। তারপর সতীশের মুখে তন্ময় হয়ে শুনলো উপেন্দ্র-সুরবালার ভালবাসার কাহিনী, তার ভালবাসার আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হলো। অকপটে নিজের প্রেম উপেন্দ্রকে নিবেদন করল। এই আশা হয়ত একটু নাটকীয় মনে হতে পারে কিন্তু কিরণময়ীর পূর্বাপর আচরণের সঙ্গে এই প্রেম নিবেদন অসংগতিপূর্ণ নয়। এর পরের অংশে শরৎচন্দ্র গুরুদেবকে অনুসরণ করেছেন। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে নিয়ে কুল-ত্যাগ করেছে অন্যকে কষ্ট দেবার জন্য, কিরণময়ী কাঁচপোকা রূপে দিবাকর-পতঙ্গকে টেনে নিয়ে গেছে আরাকান মুলুকে উপেন্দ্রর মাথা হেঁট করবার জন্য। উপেন্দ্রর চারিত্রিক নিষ্ঠার অহঙ্কার এই জন্য দায়ী।

তারপর সুরবালার মৃত্যু, সতীশের অধপতন ইত্যাদি উপেন্দ্রকে সহনশীল হতে শিখিয়েছে, উপেন্দ্র বাস্তবকে উপলব্ধি করেছেন--জীবনটা কঠোপনিষদ বা রামায়ণের কাহিনী নয়। এখানে রক্তমাংসে গড়া মানবহৃদয়-গুহায় অনন্ত রহস্য লুকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে সে রহস্য সহস্র দলে উপেন্দ্রের হৃদয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তিনি সত্যকে জেনেছেন, সে সত্য চির চঞ্চল অথচ নিত্য আরাধ্য।

তবুও সতর্ক চাটুজ্জে পরিবারের আস্তিক নিষ্ঠা শরৎচন্দ্র সরজিনীকে পরিশুদ্ধ করে সতীশের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেছেন। যক্ষ্মারোগে নিশ্চিত মৃত্যু বরণের জন্য সাবিত্রীকে উপেনদার ভগ্নী-মাহাত্ম্যদান করে প্রচুর হাততালি পেয়েছেন আর উন্মাদ কিরণময়ী তাকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসমাজে খ্যাতির শীর্ষে স্থান দিয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজে মা, বোনরূপে শরৎচন্দ্র বহু নারী চরিত্র এঁকেছেন--রমা কাশীবাসী, বন্দনার নাক খত দিয়ে চাটুজ্জে বাড়ীর বউ হওয়া, নীলিমার উদ্ভট প্রেম, অসংলগ্ন তর্কের বাণ্ডিল কমল, অবহেলিতা রাজলক্ষ্মী, চরিত্রহীন ধর্মান্তরিত স্বামীর দাসী অন্নদাদিদি সবই আদর্শ নারী। কিরণময়ী ব্যতিক্রমধর্মী। তবুও এই একটি মাত্র চরিত্রকে অবলম্বন করে শরৎচন্দ্র প্রগতিশীল আখ্যা পেতে পারেন। মৃত্যু সস্তা পরিণাম এ সত্য আমরা জানি, কিন্তু কিরণময়ী গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করলে আমরা কিছুটা শান্তি পেতাম। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা মহাপাপ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, তাই পাগল হয়েই ওর ক্লান্তি বিদূরিত হোক। সমস্ত বেদ, উপনিষদ, নাটক, নভেলে লব্ধ জ্ঞানের অবলোপ সাধিত হোক। তবুও এই কথা স্বীকার্য যে কিরণময়ীকে পরিণামে যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায়না এই সত্যতা শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন এবং সে হাস্যকর প্রচেষ্টাও তিনি করেননি। কারণ আজ নারী দশকের যুগে যতকথাই বলিনা কেন সে দিনের কিরণময়ীকে অন্তরের সহানুভূতি ছাড়া তার স্রষ্টা আর কিছুই দিতে পারেননি, দেবার চেষ্টাও করেননি। কালের জটিলতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন কিন্তু ভিতরের রক্ষণশীল মনটাকে বাঁধতে পারেননি। যদিও একথা সত্য কিরণময়ীর মুখের অনেক সংলাপই লেখকের নিজস্ব মতামত।

উপসংহারে এ কথাই বলতে পারি রোহিণী, বিনোদিনী ও কিরণময়ীর স্রষ্টাত্রয় যে মানসকন্যা রূপায়িত করেন তাঁদের কাল ও পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে আজও বঙ্কিমচন্দ্রকে বাস্তব জীবন-ভিত্তিক রূপকার রূপে আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করতে পারি। এখানে কোন দ্বিধা বা সংকোচের অবকাশ আছে বলে আমার মনে হয়না। রোমাণ্টিকতা, সস্তা আবেগ তাঁকে আদর্শভ্রষ্ট যেমন করেনি তেমনি বাস্তব সত্যের পূজারী করে তুলেছে। রোহিণী তাঁর হাতে মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই সর্বাধিক গৌরব অর্জন

করেছে। এই চরিত্র আজও উপরোক্ত তিনটি চরিত্রের ভিতর আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছে, আখি অশ্রুসিক্ত করেছে এবং সমাপ্তির পরিতৃপ্তি এনে দিয়েছে অন্ততঃ আমার পাঠক-মত এ সত্যকেই পূর্ণ হৃদয়স্পর্শী বলে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ

বঙ্কিম রচনাবলী : প্রথম খণ্ড, ভূমিকা—শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল।
বঙ্কিম প্রসঙ্গ : পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
চোখের বালি : রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, সংস্করণ ভাদ্র ১৩৮২ (এপ্রিল, ১৯৭৫)
চরিত্রহীন : শরৎ সাহিত্যস সংগ্রহ, একাদশ সম্ভার।